কর্ম্ম-যোগ

স্বামী বিবেকানন্দ



উনবিংশ সংস্করণ

এক টাকা চার আনা।

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম্ম-যোগ নামক গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ করি তখন ধারণা ছিল যে, আমেরিকান সংস্করণখানিই উৎকৃষ্টতর; সুতরাং তদবলম্বনেই অনুবাদ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে আদ্যোপান্ত সংশোধনের ইচ্ছা থাকিলেও অন্যান্য কার্য্যবশতঃ সময়াভাবে উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ পাই নাই। অনেক দিন ধরিয়া তজ্জন্য উহা অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। পরিশেষে পাঠকবর্গের আগ্রহাতিশয্যে উহা প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত ভাবেই পুনর্ম্মুদ্রিত করা হয়। সম্প্রতি একটু অবকাশ পাইয়া মাদ্রাজ সংস্করণের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম—মাদ্রাজ সংস্করণে আমেরিকান সংস্করণ অপেক্ষা এত অধিক নূতন বিষয় আছে যে, বলা যায় না। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে বিস্তৃত উদ্ধৃতাংশ ও উহার উপর স্বামিজীর মন্তব্যসমূহ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে 'প্রতীক' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই দুই সংস্করণের অনেক স্থলে এত পাঠান্তর যে অনুবাদককে বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়। অগত্যা আমরা মাদ্রাজ সংস্করণে প্রাপ্ত প্রায় সমুদয় অতিরিক্ত অংশগুলির অনুবাদ বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত করিলাম এবং পাঠান্তরস্থলে উভয় সংস্করণের তুলনা করিয়া যেটি স্পষ্টতর বোধ হইল সেইটির অনুবাদ করিয়া দিলাম। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বানুবাদের ভ্রম বা ভাষার ত্রুটিসমূহ কতক কতক সংশোধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সুতরাং কর্ম্ম-যোগের এই তৃতীয় সংস্করণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে।

ইতি—

আষাঢ়, ১৩১৬ — বিনীতানুবাদকস্য

দ্বাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

কর্ম্ম-যোগের বর্ত্তমান সংস্করণ পূর্ব্ব সংস্করণেরই পুনর্ম্মুদ্রণ। তবে ভাষা-বোধের সৌকর্য্যার্থে দুই এক স্থানে সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনাদি করা হইয়াছে মাত্র। ইতি—

পৌষ, ১৩৪০ — বিনীত— প্রকাশক

সূচীপত্র



কর্ম্ম-যোগ

প্রথম অধ্যায়

কর্ম্ম— চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব

কর্ম্ম শব্দটি সংস্কৃত 'কৃ'-ধাতু হইতে সিদ্ধ ; 'কৃ'-ধাতুর অর্থ 'করা' ; যাহা কিছু করা হয় তাহাই কর্ম্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ 'কর্ম্মফল'। দার্শনিক ভাবে ব্যবহৃত হইলে কখন কখন উহার অর্থ হয়—সেই সকল ফল, পূর্ব্ব কর্ম্ম যাহাদের কারণ। কিন্তু কর্ম্ম-যোগে আমাদের 'কর্ম্ম' শব্দটি কেবল 'কার্য্য' এই অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে। সমুদয় মানবজাতির চরম লক্ষ্য— জ্ঞানলাভ। প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই একমাত্র লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোনরূপ লক্ষ্যের কথা বলেন নাই। সুখ মানুষের চরম লক্ষ্য নহে— জ্ঞান। সুখ, আনন্দ— এ সকলের ত শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম লক্ষ্য মনে করা মানুষের ভ্রম। জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই তাহার কারণ—মানুষ অজ্ঞের মত মনে করে, সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য। কালে মানুষ বুঝিতে পারে, সে সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকে ক্রমাগত চলিয়াছে—দুঃখ-সুখ উভয়েই তাহার মহা শিক্ষক—সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতেও তদ্রূপ শিক্ষা পায়। সুখ-দুঃখ যেমন তাহার আত্মার উপর দিয়া চলিয়া যায়, অমনি তাহারা উহার

উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়া যায়, আর এই চিত্রসমষ্টি বা সংস্কার-সমষ্টির ফলকেই আমরা মানব-চরিত্র বলি। কোন ব্যক্তির চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে—উহা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের প্রবৃত্তি, মনের প্রবণতাসমূহের সমষ্টিমাত্র। তুমি দেখিবে—তাহার চরিত্রগঠনে সুখ-দুঃখ উভয়ে সমান উপাদান; তাহার চরিত্রকে এক বিশেষরূপ ছাঁচে ঢালিবার পক্ষে ভাল-মন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে; কোন কোন স্থলে বরং দুঃখ-সুখ হইতে অধিক শিক্ষা দিয়াছে, দেখা যায়। জগতের সমুদয় মহা-পুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে দুঃখ সুখ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে— দারিদ্র্য ধন হইতে অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা হইতে নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানাগ্নির প্রস্ফুরণে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি, মানুষ 'জানে', ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে—আবিষ্কার করে (discover)। মানুষ যাহা 'শিক্ষা' করে, প্রকৃতপক্ষে সে উহা আবিষ্কার করে। Discover শব্দের 'অর্থ— অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনেই অবস্থিত

ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। জগৎ যত প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সমুদয়ই মন হইতে। জগতের অনন্ত পুস্তকাগার তোমার মনে। বহির্জ্জগৎ কেবল তোমার নিজ মনকে অধ্যয়ন করিবার উত্তেজক কারণ—উপযোগী অবস্থা-স্বরূপ, কিন্তু সকল সময়েই তোমার নিজ মনই তোমার অধ্যয়নের বিষয়। আপেলের পতন নিউটনের পক্ষে উদ্দীপক কারণ-স্বরূপ হইল, তখন তিনি নিজ মন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মনের ভিতরকার পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত ভাবপরম্পরারূপ শৃঙ্খলগুলি পুনরায় আর একভাবে সাজাইতে লাগিলেন এবং উহাদের ভিতর আর একটি শৃঙ্খল আবিষ্কার করিলেন। উহাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। উহা আপেল অথবা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কোন পদার্থে ছিল না। অতএব ব্যবহারিক বা পারমার্থিক সমুদয় জ্ঞানই মানুষের মনে। অনেক স্থলেই উহারা আবিষ্কৃত (অনাবৃত) থাকে না, বরং আবৃত থাকে। যখন এই আবরণ অল্প অল্প করিয়া সরাইয়া লওয়া হয়, তখন আমরা বলি 'আমরা শিক্ষা করিতেছি,' আর এই আবিষ্করণ-প্রক্রিয়া যতই চলিতে থাকে, ততই জ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে। যে পুরুষের এই আবরণ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, তিনি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ; যে ব্যক্তির আবরণ খুব বেশী, সে অজ্ঞান ; আর যে মানুষ হইতে উহা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। প্রাচীনকালে অনেক সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, আমার বিশ্বাস একালেও অনেক হইবেন, আর আগামী যুগসমূহেও অসংখ্য সর্ব্বজ্ঞ

পুরুষ জন্মাইবেন। যেমন একখণ্ড চকমকিতে অগ্নি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান মনের মধ্যেই রহিয়াছে, উদ্দীপক কারণটি ঘর্ষণ-স্বরূপ সেই অগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়। আমাদের সকল ভাব ও কার্য্যসম্বন্ধেও তদ্রূপ; যদি আমরা ধীরভাবে নিজেদের অন্তঃকরণকে অধ্যয়ন করি, তবে দেখিব আমাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বর-অভিসম্পাত, নিন্দা-সুখ্যাতি সমুদয়গুলিই আমাদের মনের উপর বহির্জ্জগতে অনেক ঘাতপ্রতিঘাত হইতে, আমাদের নিজেদের ভিতর হইতেই উৎপন্ন। উহাদের ফলেই আমাদের বর্ত্তমান চরিত্র গঠিত; এই সমুদয় ঘাতগুলিকে একত্রে 'কর্ম্ম' বলে। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে বাহির করিবার জন্য, উহার নিজ শক্তি ও জ্ঞান-প্রকাশের জন্য যে কোন মানসিক বা ভৌতিক ঘাত প্রদত্ত হয় তাহাই কর্ম্ম; কর্ম্ম অবশ্য এখানে উহার ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত। অতএব আমরা সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতেছি। আমি কথা কহিতেছি—ইহা কর্ম্ম। তোমরা শুনিতেছ—ইহাও কর্ম্ম। আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছি —ইহা কর্ম্ম। বেড়াইতেছি— কর্ম্ম। কথা কহিতেছি— কর্ম্ম। শারীরিক বা মানসিক যাহা কিছু আমরা করি, তাহাই কর্ম্ম। উহারা আমাদিগের উপর উহাদের ছাপ রাখিয়া যাইতেছে।

কতকগুলি কার্য্য আছে, সেগুলি যেন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের সমষ্টিস্বরূপ। যদি আমরা শৈলখণ্ডপূর্ণ সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া উহার উপর উর্ম্মিমালার প্রতিঘাত শুনিতে থাকি, তখন উহাকে কি ভয়ানক শব্দ বলিয়া বোধ হয়! কিন্তু আমরা

জানি, একটি তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ-সংগঠিত। উহাদের প্রত্যেকটি হইতেই শব্দ হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহা শুনিতে পাই না; যখনই উহারা একত্র হইয়া প্রবলাকার ধারণ করে, তখনই আমরা প্রবল শব্দ শুনিতে পাই। এইরূপে হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনেই কার্য্য হইতেছে। কতকগুলি কার্য্য আমরা বুঝিতে পারি, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তথাপি তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মসমষ্টিস্বরূপ। যদি তুমি কোন ব্যক্তির চরিত্র যথার্থ বিচার করিতে চাও, তবে তাহার বড় বড় কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিও না। অবস্থা-বিশেষে নিতান্ত নির্ব্বোধও বীরতুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। লোককে তাহার অতি সামান্য কার্য্য করিবার সময় লক্ষ্য কর, উহাতেই মহৎ লোকের প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারিবে। বড় বড় ঘটনায় সামান্য লোককে পর্য্যন্ত মহত্তুল্য করিয়া তুলে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই যাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব লক্ষিত হয়, তিনি প্রকৃত মহৎ লোক।

মানুষকে যত প্রকার শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে কর্ম্মের দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম শক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমুদয় শক্তি তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন, ঐ কেন্দ্রতেই উহাদিগকে গালাইয়া মিশাইতেছেন, তারপর খুব প্রবল একটি তরঙ্গাকারে উহাদিগকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছেন। সেই কেন্দ্রই প্রকৃত মানুষ, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, আর

তিনি তাঁহার নিজের দিকে সমুদয় জগৎকে আকর্ষণ করিতেছেন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই তাঁহার দিকে চলিয়াছে, গিয়া যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে জড়াইতেছে। তিনি তাহাদের মধ্য হইতে চরিত্র নামক মহাশক্তি গঠন করিয়া লইয়া উহাকে বহির্দ্দেশে প্রক্ষেপ করিতেছেন। যেমন তাঁহার ভিতরে গ্রহণ করিবার শক্তি আছে, তদ্রূপ বাহিরে প্রক্ষেপ করিবারও শক্তি আছে।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, আমরা জগতে যত প্রকার কার্য্য দেখিতে পাই, মনুষ্য-সমাজে যত প্রকার গতি হইতেছে, আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল কার্য্য হইতেছে, উহারা কেবলমাত্র চিন্তার প্রকাশমাত্র, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশমাত্র। যন্ত্রসমূহ, নগর, জাহাজ, যুদ্ধজাহাজ সবই মানুষের ইচ্ছার বিকাশমাত্র। এই ইচ্ছা আবার চরিত্র হইতে গঠিত, চরিত্র আবার কর্ম্মগঠিত। যেমন কর্ম্ম, ইচ্ছার প্রকাশও তদনুরূপ। জগতে যত প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই কঠোর কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহাদের এত শক্তি ছিল যে, তাঁহারা জগৎকে উলটিয়া পালটিয়া দিতে পারিতেন। ঐ শক্তি তাঁহারা যুগে যুগে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মদ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বা যীশুর ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তি এক জন্মে লাভ করা যায় না। আর উহাকে পুরুষানুক্রমিক শক্তিসঞ্চারও (hereditary transmission) বলা যায় না; কারণ, আমরা জানি তাঁহাদের পিতা কাহারা ছিলেন। তাঁহাদের পিতারা যে জগতের হিতের জন্য কখন কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই। যোশেফের

ন্যায় লক্ষ লক্ষ সূত্রধর জীবলীলাসম্বরণ করিয়াছে; লক্ষ লক্ষ এখনও জীবিত রহিয়াছে। বুদ্ধের পিতার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজা জগতে ছিলেন। যদি ইহা কেবলমাত্র পুরুষানুক্রমিক শক্তিসঞ্চারের উদাহরণ হয়, তবে এই ক্ষুদ্র সামান্য রাজা, যাঁহাকে হয়ত তাঁহার ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত মানিত না, কিরূপে এমন এক সন্তানের জনক হইলেন, যাঁহাকে জগতের অর্দ্ধেক লোক উপাসনা করিতেছে? সূত্রধর ও তাঁহার এই সন্তানের (যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ লোক ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেছে) মধ্যে এই যে অনতিক্রমণীয় প্রভেদ, তাহাই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? পূর্ব্বোক্ত মত দ্বারা উহার ব্যাখ্যা হয় না। বুদ্ধ জগতে যে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, যাহা যীশুর ভিতর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কোথা হইতে আসিল? এই শক্তিসমষ্টি কোথা হইতে আসিল? অবশ্য উহা যুগযুগান্তর হইতে ঐ স্থানেই ছিল। ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছিল। অবশেষে সমাজে উহা বুদ্ধ বা যীশু নামে প্রবল শক্তির আকারে প্রকাশ পাইল। এখনও ঐ শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

আর এই সমুদয়ই কর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত। উপার্জ্জন না করিলে কেহ কিছু পাইতে পারে না। ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা মনে করিতে পারি, আমরা ফাঁকি দিয়া কিছু লাভ করিব, কিন্তু আখেরে আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দৃঢ়বিশ্বাসী হইতে হয়। কোন লোক সমুদয় জীবন ধনী হইবার চেষ্টা করিল, সে সহস্র

সহস্র ব্যক্তিকে প্রতারণা করিল, কিন্তু সে অবশেষে দেখিতে পায় যে, সে সেই সমস্ত ধনভোগের প্রকৃত উপযুক্ত নহে। তখন তাহার জীবন তাহার পক্ষে কষ্টকর ও ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য অসংখ্য ধন সংগ্রহ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা নিজ কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করি, তাহাতেই আমাদের অধিকার। একজন নির্ব্বোধ জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাহার পুস্তকাগারে কেবল পড়িয়া থাকিবে মাত্র। সে যেগুলি পড়িবার উপযুক্ত সেগুলিই পড়িতে পারিবে, আর এই অধিকার কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন। আমাদের কর্ম্মই আমরা কিসের অধিকারী, কোন্ বস্তুই বা আমরা নিজের ভিতরে গ্রহণ করিতে পারি, তাহার নির্ণায়ক। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, আর আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হয়, তবে ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইবে যে, আমরা ভবিষ্যতে যাহা হইতে ইচ্ছা করি আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্ম দ্বারাই তাহা হইতে পারি। অতএব আমাদের কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে, জানা উচিত। তোমরা হয়ত বলিবে, "কর্ম্ম কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আবার শিখিবার প্রয়োজন কি? সকলেই ত এই জগতে কার্য্য করিতেছে।" কিন্তু কথা এই, শক্তির অনর্থক ক্ষয় বলিয়া একটি জিনিস রহিয়াছে। গীতায় এই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, 'কর্ম্মযোগের অর্থ কর্ম্মের কৌশল—বৈজ্ঞানিক

প্রণালীতে কর্ম্মানুষ্ঠান।' কর্ম্ম কি করিয়া করিতে হয় জানিতে হইবে, তবেই তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতম ফললাভ হইবে। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই সমুদয় কর্ম্মের উদ্দেশ্য—মনের ভিতর পূর্ব্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করা—আত্মার জাগরণ। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এই শক্তি রহিয়াছে এবং জ্ঞানও রহিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন কর্ম্ম যেন উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য—ঐ দৈত্যকে জাগরিত করিবার জন্য—ঘাতস্বরূপ।

মানুষ নানা অভিসন্ধিতে কার্য্য করিয়া থাকে। কোন অভিসন্ধি ব্যতীত কার্য্য হইতেই পারে না। কোন কোন লোক যশ চাহে; তাহারা যশের জন্য কার্য্য করে। অপর কেহ কেহ অর্থ চাহে; তাহারা অর্থের জন্য কার্য্য করে। অপর কেহ কেহ প্রভুত্ব চাহে; তাহারা প্রভুত্বলাভের জন্য কার্য করে। অপরে স্বর্গে যাইতে চাহে; তাহারা স্বর্গে যাইবার জন্য কার্য্য করে। অপরে আবার মৃত্যুর পর আপনার নাম রাখিয়া যাইতে চাহে; চীনদেশে এইরূপ হইয়া থাকে— সেখানে না মরিলে কোন উপাধি দেওয়া হয় না; বিচার করিয়া দেখিলে এই প্রথা আমাদের অপেক্ষা ভাল বলিতে হইবে। কোন লোক খুব ভাল কাজ করিলে, তাহার মৃত পিতা বা পিতামহকে কোন মাননীয় উপাধি প্রদান করা হয়। কতকগুলি মুসলমান সম্প্রদায় সমস্ত জীবন, কেবল মৃত্যুর পর একটি প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দিরে সমাহিত হইবার জন্য, কার্য্য করিয়া থাকে। আমি এমন কয়েকটি সম্প্রদায়ের কথা জানি, যাঁহাদের

মধ্যে শিশু জন্মিবামাত্র তাহার জন্য সমধি-মন্দির নির্ম্মিত হইতে থাকে। ইহাই তাহাদের বিবেচনায় মানুষের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্ম ; ঐ সমধি-মন্দির যত বৃহৎ ও সুন্দর হয়, সেই ব্যক্তি ততই সুখী বলিয়া বিবেচিত হয়। কেহ কেহ আবার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যত প্রকার অসৎ কার্য্য সব করিয়া শেষে একটি মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিলেন ; অথবা পুরোহিতগণকে কিনিয়া লইবার জন্য ও তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গে যাইবার ছাড় পাইবার জন্য কিছু তাঁহাদিগকে দিলেন। তাঁহারা মনে করেন, ইহাতেই তাঁহাদের রাস্তা পরিষ্কার হইল, ইহাতেই তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবেন। মানুষের কার্য্য-প্রবৃত্তির নিয়ামক এই সকল এবং এতদ্রূপ অনেক অভিসন্ধি আছে।

এক্ষণে কার্য্যের জন্যই যে কার্য্য তাহার আলোচনা করা যাক। সকল দেশেই এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জগতের প্রকৃত সুসন্তান ; ইহারা কার্য্যের জন্যই কার্য্য করেন। ইহারা নাম-যশের কাঙ্গালী নহেন, অথবা স্বর্গে যাইতেও চাহেন না। তাঁহারা কার্য্য করেন, কেবল উহাতে লোকের প্রকৃত উপকার হয় বলিয়া। আবার অপর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা আরও উচ্চতর অভিসন্ধি লইয়া দরিদ্রদিগের উপকার ও মনুষ্য-জাতিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা ঐ কার্য্য ভাল বলিয়া ও ঐ সৎকার্য্যকে ভালবাসেন বলিয়াই উহা করিয়া থাকেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-প্রবৃত্তির নিয়ামক অভিসন্ধিগুলি সম্বন্ধে বিচার করা যাক। প্রথমে নাম-যশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

এই নাম-যশের চেষ্টায় সচরাচর তৎক্ষণাৎ ফল পাওয়া যায় না। ইহারা সচরাচর আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয় যখন আমরা বৃদ্ধ হই, যখন আমাদের জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কোন স্বার্থপূর্ণ-উদ্দেশ্য-বিরহিত হইয়া কার্য্য করে তাহার কি হয়? সে কি কিছু লাভ করে না? হাঁ, সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হয়। নিঃস্বার্থপরতাতেই অধিক লাভ আছে, কেবল লোকের উহা অভ্যাস করিবার জন্য সহিষ্ণুতা নাই। সাংসারিক হিসাবেও ইহা খুব লাভজনক। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থ-পরতা— এগুলি নীতি-সম্বন্ধীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা নহে, উহারা আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, কারণ উহারা শক্তির মহান্ বিকাশ-স্বরূপ। প্রথমতঃ, যে ব্যক্তি পাঁচ দিন অথবা পাঁচ মিনিট কোন-রূপ স্বার্থাভিসন্ধি-শূন্য হইয়া ভবিষ্যতের কোন উদ্দেশ্য না রাখিয়া বা স্বর্গলাভাকাজ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া বা কোনরূপ শাস্তির ভয়ে ভীত না হইয়া অথবা ঐরূপ কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ হইয়া যান। ইহা কার্য্যে পরিণত করা অতি কঠিন। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে আমরা উহার মূল্য এবং উহা কি মহান্ শুভ প্রসব করে—তাহা জানি। উহা শক্তির মহোচ্চ বিকাশ-স্বরূপ—উহাতে প্রবল সংযমের প্রয়োজন। সমুদয় বহির্ম্মুখ কার্য্য অপেক্ষা এই সংযম অধিক-তর শক্তির প্রকাশ। চতুরশ্ববাহিত শকট কোন প্রকার প্রতি-রোধশূন্য হইয়া পাহাড়ে গড়াইয়া নীচে চলিয়া যাইতে পারে অথবা শকটবান অশ্বগণকে সংযত করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে

কোন্‌টি অধিকতর শক্তির বিকাশ? অশ্বগণকে ছাড়িয়া দেওয়া বা উহাদিগকে সংযত করা? একটি বল বায়ুর মধ্য দিয়া উড়িয়া গিয়া অনেক দূরে যাইয়া পড়িতে পারে, অপরটি দেয়ালে লাগিয়া গিয়া বেশী দূরে যাইতে পারিল না; কিন্তু তাহাতে প্রবল তেজ উৎপন্ন হইল। এইরূপে মনের এই সমুদয় বহির্ম্মুখ গতি স্বার্থাভিসন্ধির দিকে ধাবিত হওয়াতে উহারা আর তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তোমার শক্তিবিকাশে সাহায্য করে না, কিন্তু উহাদিগকে সংযত করিলে তোমার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। সংযম হইতে মহতী ইচ্ছা-শক্তি উৎপন্ন হইবে; উহা এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করিবে, যাহা ইঙ্গিতে জগৎকে পরিচালনা করিতে পারে। অজ্ঞ লোকেরা এই রহস্য জানে না, তাহারা জগতের উপর প্রভুত্ব করিতে চায়। নির্ব্বোধ লোকে জানে না যে, সে যদি কিছুদিন অপেক্ষা করে, সে সমুদয় জগৎ শাসন করিতে পারে। কিছুদিন অপেক্ষা কর, এই অজ্ঞানসুলভ জগৎশাসনের ভাবকে সংযত কর, ঐ ভাব সম্পূর্ণ চলিয়া গেলেই তুমি জগৎশাসন করিতে পারিবে। মানুষ সামান্য দুই-চার টাকার লাভের আশায় ধাবিত হয় এবং উহা লাভের জন্য নিজ প্রতিবাসীকেও ঠকাইতে দ্বিধা বোধ করে না, কিন্তু যদি সে ঐ লোভটুকু সংযত করিতে পারে, কিছুদিনের মধ্যে তাহার চরিত্র এরূপ গঠিত হইবে যে, যদি সে লক্ষ টাকা চায় তাহাও অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু আমরা কি নির্ব্বোধ! যেমন অনেক পশু কয়েক পদ অগ্রে কি আছে তাহার কিছুই জানিতে পারে না, আমাদের মধ্যে অনেকেই তদ্রূপ অল্প কয়েক

বৎসর পরেই কি ঘটিবে, তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারে না। আমরা যেন একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ—আর উহাই আমাদের সমুদয় জগৎ। আমরা উহার অতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না এবং তজ্জন্যই অসাধু ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পড়ি। ইহা আমাদের দুর্ব্বলতা—শক্তিহীনতা।

কিন্তু অতি সামান্য কর্ম্মকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। যে স্বার্থপর অভিসন্ধি ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর অভিসন্ধিতে কার্য্য করিতে অক্ষম, সে স্বার্থপর অভিসন্ধিতেই—নামযশের জন্যই কার্য্য করুক। কিন্তু মানুষের সর্ব্বদাই উচ্চ হইতে উচ্চতর অভিসন্ধিযুক্ত হইতে এবং ঐ অভিসন্ধিগুলি কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। 'কর্ম্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নহে'—ফল যাহা হইবার হউক—উহার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিও না। ফলের জন্য কে আকাঙ্ক্ষা করে? কোন লোককে সাহায্য করিবার সময় সেই ব্যক্তির ভাব তোমার প্রতি কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে মনে কোনরূপ চিন্তাকে স্থান দিও না। উহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিও না। তুমি যদি কোন মহৎ বা শুভ কার্য্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না।

আবার এইরূপ কার্য্য সম্বন্ধে, আর একটি কঠিন সমস্যা আসিয়া পড়ে। তীব্র কর্ম্মশীলতার প্রয়োজন; আমাদের সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতে হইবে, আমরা এক মিনিটও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। তবে মানুষের বিশ্রাম কোথায়? একদিকে কর্ম্ম—মহা জীবন-সংগ্রাম—সামাজিক জীবনের আবর্ত্তে তীব্র

ঘূর্ণন। আবার আর একটি চিত্র—সবই শান্তিময়—সবই যেন নিবৃত্তি-উন্মুখ—চতুর্দ্দিকে সব স্থির ধীর—কোনরূপ শব্দ-কোলাহল নাই বলিলেই হয়—কেবল প্রকৃতির শান্তিময় ছবি চতুর্দ্দিকে। এই দুইটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নহে। কোন লোক এইরূপ শান্তি-পূর্ণ স্থানে বাস করিলেন; যখনই তিনি জগতের মহাবর্ত্তে পড়িবেন, তখনই তিনি একেবারে উহাতে ধ্বংস হইয়া যাইবেন; যেমন গভীর-সমুদ্রতলবাসী মৎস্য সমুদ্রের উপরিদেশে আসিবা-মাত্র খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়; কারণ জলের প্রবল চাপেই উহা জীবিত অবস্থায় থাকিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের কোলাহলেই অভ্যস্ত, সে কি কোন নিভৃত স্থানে বাস করিতে পারে? এইরূপ চেষ্টায় তাহাকে শেষে বাতুলালয়ে যাইতে হয়। আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্ম্মী এবং প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভব করেন। তিনি সংযম-রহস্য বুঝিয়াছেন—আত্মসংযম করিয়াছেন। বাণিজ্যবহুল মহানগরীতে ভ্রমণ করিলেও নিঃশব্দ গুহায় অবস্থিতের ন্যায় তাঁহার মন শান্ত থাকে, অথচ তাঁহার মন তীব্রভাবে কর্ম্ম করিতেছে। কর্ম্মযোগীর ইহাই আদর্শ। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই তুমি কর্ম্মের প্রকৃত রহস্যবিৎ হইলে।

কিন্তু আমাদিগকে গোড়া হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া নিঃস্বার্থপরতা

শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্ম্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি স্বার্থপূর্ণই থাকে, কিন্তু অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যাইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে যখন আমরা মধ্যে মধ্যে নিঃস্বার্থ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে, জীবনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কোন না কোন সময়ে এমন একদিন আসিবে, যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্ত্তে আমরা ইহাতে সমর্থ হইব, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের শক্তি এক-কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে কেহই ছোট নহে

সাংখ্যদর্শন মতে প্রকৃতি তিনটি উপাদানে নির্ম্মিত—সংস্কৃত-ভাষায় ঐ উপাদানত্রয়ের নাম তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব। তমঃ—অন্ধকার বা কর্ম্মশূন্যতারূপে ব্যাখ্যাত। রজঃ—কর্ম্মশীলতা; প্রত্যেক পরমাণুই যেন আকর্ষক কেন্দ্র হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। আর সত্ত্ব—ঐ দুইটির সাম্যাবস্থা—উভয়েরই সংযম।

প্রত্যেক ব্যক্তিই এই উপাদানত্রয়-নির্ম্মিত। আমাদের সকলের ভিতরেই দেখিতে পাই, কখন তমঃ প্রবল হইল; আমরা আলস্যপরায়ণ হইলাম, আমরা যেন আর কোনদিকে নড়িতে পারি না। নিষ্কর্ম্মা হইয়া কতকগুলি ভাব-সমষ্টির দাস হইয়া পড়ি। আবার কখন কখন কর্ম্মশীলতা প্রবল হইল; অন্য সময়ে আবার উভয়টিই সংযত হইল—মনে শান্ত ভাব আসিল—ইহাই সত্ত্ব। আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে সচরাচর এই উপাদানত্রয়ের কোন কোনটির প্রাধান্য থাকে। একজন হয়ত কর্ম্মশূন্যতা, আলস্য ও জাড্যলক্ষণান্বিত। অপরের প্রধান লক্ষণ—কর্ম্মশীলতা; শক্তি, মহাশক্তির বিকাশ। আবার অপর পুরুষে আমরা শান্ত মৃদুমধুর

ভাব দেখিতে পাই; উহা ঐ পূর্ব্বোক্ত গুণদ্বয়ের অর্থাৎ কর্ম্ম-শীলতা ও কর্ম্মশূন্যতার সংযম বা সামঞ্জস্যস্বরূপ। এইরূপ সমুদয় সৃষ্ট জগতে—পশু, উদ্ভিদ, মানুষ সকলেই আমরা এই বিভিন্ন উপাদানগুলির প্রতিরূপ দেখিতে পাই।

এই ত্রিবিধ উপাদান লইয়া কর্ম্ম-যোগের বিশেষ কার্য্য। উহাদের স্বরূপ ও ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা দিয়া কর্ম্মযোগ আমাদিগকে ভালরূপে কর্ম্ম করিবার উপায় শিক্ষা দেয়। মানব-সমাজ একটি ক্রমনিবদ্ধ সংহতিস্বরূপ। উহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সকলেই যেন এক এক শ্রেণীবদ্ধ ও বিভিন্ন সোপানে অবস্থিত। আমরা সদাচার ও কর্ত্তব্য কাহাকে বলে, সকলেই জানি; কিন্তু আবার দেখিতে পাই, বিভিন্ন দেশে এই সদাচারের ধারণা অত্যন্ত বিভিন্ন। এক দেশে যাহা সদাচার বলিয়া বিবেচিত হয়, অপর দেশে হয় ত তাহা সম্পূর্ণ অসদাচার বলিয়া পরিগণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—কোন কোন দেশে জ্ঞাতি ভাই-ভগিনীতে পরস্পর বিবাহ হইতে পারে, অপর দেশে আবার উহা অতিশয় সদাচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন দেশে পুরুষে নিজ শ্যালিকাকে বিবাহ করিতে পারে, অপর দেশে উহা সদাচারবিরুদ্ধ। কোন দেশে লোকে একবার মাত্র বিবাহ করিতে পারে, অপর দেশে অনেক বার। এইরূপে আমরা সদাচারের অন্যান্য বিভাগেও দেখিতে পাই যে, উহার আদর্শ বিভিন্ন দেশে অতিশয় বিভিন্ন। তথাপি আমাদের মনে ধারণা—সদাচারের একটি সার্ব্বভৌম আদর্শ

আছে। কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও এইরূপ। কর্ত্তব্যের ধারণা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অত্যন্ত ভিন্ন। কোন দেশে যদি কোন ব্যক্তি কার্য্যবিশেষ না করে, লোকে বলিবে সে অন্যায় করিয়াছে; অপর দেশে আবার ঠিক সেই কার্য্যগুলি করিলেই লোকে বলিবে সে ঠিক করে নাই। তথাপি আমরা জানি কর্ত্তব্যের অবশ্য একটি সার্ব্বজনীন দিক আছে। এইরূপে সমাজবিশেষ কার্য্যবিশেষকে তাহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত করে, অপর সমাজ আবার ঠিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করে এবং উহাকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের দুইটি পথ খোলা। হয় অজ্ঞ লোকের ধারায় বিশ্বাস কর—যাহারা মনে করে সত্যলাভের উপায় মাত্র এক, আর সব উপায় ভ্রমাত্মক; অথবা জ্ঞানীর পথ ধর—যিনি স্বীকার করেন মানসিক গঠন অথবা আমরা সকলে যে সকল বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত তাহাদের তারতম্য অনুসারে কর্ত্তব্য ও সদাচার ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সুতরাং প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কর্ত্তব্য ও সদাচারের বিভিন্ন ক্রম আছে; এক অবস্থার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, অপর অবস্থায়—অন্যরূপ দেশকালপাত্রে—তাহা নহে।

নিম্নলিখিত উদাহরণটি দ্বারা এই তত্ত্ব উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সকল মহাপুরুষেরই উপদেশ—'অশুভের প্রতীকারচেষ্টা করিও না, অশুভের অপ্রতীকারই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।' আমরা সকলেই জানি, যদি আমরা জনকয়েকও

ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, সমুদয় সমাজবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে—সমাজের বিনাশ-দশা সমুপস্থিত হইবে, দুষ্ট লোকের হস্তে আমাদের সম্পত্তি ও জীবন যাইবে; তাহারা আমাদের উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। একদিনও এইরূপ 'অপ্রতীকারধর্ম্ম' কার্য্যে পরিণত করিলে সমাজের সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে। তথাপি আমরা প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে 'অপ্রতীকার'-রূপ উপদেশের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকি, আমরা উহাকে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করি; কিন্তু কেবলমাত্র ঐ মত প্রচার করিলে অসংখ্য মানবকে অন্যায়কর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করা হইল। শুধু তাহাই নহে, উহাতে মানুষের মনে সর্ব্বদাই বোধ হইবে যে, সে সর্বদাই অন্যায় করিতেছে; সুতরাং তাহার সকল কার্য্যেই মন খুঁত খুঁত করিবে। ইহাতে তাহার মনকে দুর্ব্বল করিয়া দিবে; আর এইরূপ প্রতিনিয়ত আত্মগ্লানি অন্যান্য দুর্বলতা হইতে অধিক পাপ প্রসব করিবে। যে ব্যক্তি আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জাতি সম্বন্ধেও এই কথা।

আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য—আপনাকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথম নিজের প্রতি, তারপর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আবশ্যক। যাহার নিজের প্রতি বিশ্বাস নাই, তাহার ঈশ্বরের প্রতি কখনই বিশ্বাস আসিতে পারে না। তাহা হইলে 'কর্ত্তব্য ও সদাচার অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন' ইহা

স্বীকার করা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই। অন্যায়ের প্রতীকার করিলেই যে তাহা অন্যায় হইল, তাহা নহে। সে যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে প্রতীকার করা তাহার কর্ত্তব্য হইতে পারে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে তোমরা অনেকে ভগবদ্গীতার প্রথমাধ্যায় —যেখানে অর্জ্জুন তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বলিয়া এবং 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বলিয়া যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কাপুরুষ ও কপটী বলিতেছেন—পাঠ করিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইয়াছ। এইটি একটি প্রধান বুঝিবার বিষয় যে, কোন ব্যাপারের দুই চরম বিপরীত প্রান্ত দেখিতে একই প্রকার। চূড়ান্ত 'অস্তি' ও চূড়ান্ত 'নাস্তি' সকল সময়েই সদৃশ। আলোক-কম্পনের অতি মৃদুতায় উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতি দ্রুত কম্পনেও তদ্রূপ। শব্দ সম্বন্ধেও তদ্রূপ; অতি মৃদু হইলেও উহা শুনা যায় না, অতি উচ্চ হইলেও শুনা যায় না। 'প্রতীকার' ও 'অপ্রতীকারে' এইরূপ প্রভেদ। একজন লোক কোন অন্যায়ের প্রতীকার করে না—কারণ সে দুর্ব্বল, অলস ও প্রতিকারে অক্ষম। প্রতিকারের ইচ্ছা নাই বলিয়া প্রতিকার করে না, তাহা নহে। আর একজন জানেন, ইচ্ছা করিলে তিনি দুর্দ্দমনীয় আঘাত প্রদান করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে শুধু আঘাত করেন না তাহা নহে, বরং শত্রুকে আশীর্ব্বাদ করেন। যে ব্যক্তি

দুর্ব্বলতাবশতঃ 'প্রতিকার' করে না, সে পাতকগ্রস্ত হয়; সুতরাং তাহার এই 'অপ্রতিকার' হইতে কোন উপকার লাভ করিতে পারে না। অপর ব্যক্তি আবার প্রতিকার করিয়া পাপ সঞ্চয় করে। বুদ্ধ নিজ সিংহাসন ও রাজপদ ত্যাগ করিলেন; ইহা প্রকৃত ত্যাগ বটে, কিন্তু যাহার ত্যাগ করিবার কিছুই নাই এমন ভিক্ষুকের পক্ষে ত্যাগের কোন কথা আসিতে পারে না। অতএব এই 'অপ্রতিকার' ও 'আদর্শ প্রেমের' কথা বলিবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন্ বিষয়টিকে লক্ষ্য করিতেছি, সেই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আগে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত, আমাদের প্রতিকারের শক্তি আছে কি না। তার-পর যদি আমাদের শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতীকারচেষ্টা-শূন্য হই, তবে আমরা মহৎ কর্ম্ম করিতেছি বটে; কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, আর যদি আপনার মনকে আপনি বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্রেরণায় কার্য্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত করিতেছি বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুনও এইরূপে তাঁহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্যব্যূহ সজ্জিত দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার 'ভালবাসা' তাঁহার দেশের ও রাজার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলাইয়া দিয়াছিল। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়াছিলেন। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।" "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।" অর্থাৎ তুমি শোকের

অযোগ্য ব্যক্তিদিগের জন্য শোক করিতেছ অথচ পণ্ডিতের মত কথা কহিতেছে। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠ।—গীতা, ২য় অধ্যায়, ১১ ও ৩৭ শ্লোক।

কর্ম্মযোগীর এই ভাব। কর্ম্মযোগী জানেন, আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ—এই অপ্রতিকার। তিনি আরও জানেন যে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ; আর 'অন্যায়ের প্রতীকার' কেবল 'অপ্রতিকার'-রূপ শ্রেষ্ঠতম শক্তিলাভের সোপানমাত্র। এই সর্ব্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পূর্ব্বে 'প্রতীকার' করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে—যতদূর সাধ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। যখন তিনি এই প্রতীকারের শক্তি লাভ করিবেন, তখনই অপ্রতিকার তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

আমাদের দেশে একটি লোকের সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় অলস, নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়া জানিতাম। তাহার জ্ঞানলাভেরও কিছু আগ্রহ ছিল না—সে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিল। আমার সহিত দেখা হইলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে, আমি কি উপায়ে মুক্ত হইব?' আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি মিথ্যা কথা কহিতে পার কি?' সে বলিল, 'না'। তখন আমি বলিলাম, "তবে তোমায় মিথ্যা কহিতে শিখিতে

হইবে। একটা পশুর মত বা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের মত জড়বৎ জীবন-যাপন অপেক্ষা মিথ্যা কথা বলা ভাল। তুমি অকর্ম্মণ্য; নিষ্ক্রিয় অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করে ও যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, তাহা নিশ্চিত তোমার লাভ হয় নাই। তুমি এতদূর জড়প্রকৃতি যে, তোমার একটা অন্যায় কাজ করিবারও ক্ষমতা নাই।' অবশ্য যে লোকটির কথা বলিতেছি, সে লোকটির মত তামসিক প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যায় না, আর আমি তাহার সহিত উপহাস করিতেছিলাম, কিন্তু আমার ভাব ছিল এই যে, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা শান্তভাব লাভ করিতে হইলে তাহাকে কর্ম্মশীলতার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

আলস্যকে সর্ব্ব প্রকারেই ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রিয়া-শীলতা অর্থে সর্ব্বদাই 'প্রতিকার' বুঝাইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রতিকার কর; যখন তুমি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবে তখন শান্তি আসিবে। ইহা বলা অতি সহজ যে, 'কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কোন অমঙ্গলের প্রতীকার করিও না,' কিন্তু কার্য্যকালে ইহা কতদূর দাঁড়ায়, তাহা ত আমরা জানি। যখন সমুদয় সমাজের চক্ষু আমাদের দিকে পড়ে, তখন আমরা 'অপ্রতিকারের' ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু বাসনা দিবারাত্র দূষিত ক্ষতের ন্যায় আমাদের শরীরকে ক্ষয় করিতে থাকে। যথার্থ অপ্রতিকারের ভাব আসিলে প্রাণে যে শান্তি-অনুভব হয়; আমরা তাহার সম্পূর্ণ

অভাব অনুভব করি; মনে হয়—প্রতীকার করাই ভাল। তোমার অন্তরে যদি ঐশ্বর্য্যের বাসনা থাকে, আর যদি তোমার জানা থাকে যে, সমুদয় জগৎ তোমাকে বলিবে—ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ অসৎ লোক—তবে তুমি হয় ত ঐশ্বর্য্য-অন্বেষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে সাহসী না হইতে পার, কিন্তু তোমার মন দিবা-নিশি অর্থের দিকে দৌড়াইতেছে। ইহা কপটতা মাত্র, ইহাতে কোন কার্য্য হয় না। সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, কিছুদিন পরে যখন সংসারে যাহা কিছু আছে ভোগ করিয়া শেষ করিবে, তখনই বৈরাগ্য আসিবে—তখনই শান্তি আসিবে। অতএব প্রভুত্বলাভের বাসনা এবং অন্য যাহা কিছু বাসনা আছে, সমুদয় অগ্রে পূরণ করিয়া লও; তারপর এই সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইলে এমন এক সময় আসিবে, যখন জানিতে পারিবে, এগুলি অতি ক্ষুদ্র জিনিস। কিন্তু যতদিন না তুমি বাসনা পূরণ করিতেছ, যতদিন না তুমি এই ক্রিয়া-শীলতার মধ্য দিয়া যাইতেছ, ততদিন তোমার পক্ষে এই শান্তভাব লাভ করা অসম্ভব। এই অহিংসাতত্ত্ব সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে—জাত ব্যক্তিমাত্রেই বাল্যকাল হইতে ইহা শুনিয়া আসিতেছে, তথাপি জগতে ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত লোক খুব কম দেখিতে পাই। আমি ত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের উপর ঘুরিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু আমি আমার জীবনে কুড়িটি যথার্থ শান্তপ্রকৃতি ও অহিংসক ব্যক্তি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে কেহই ছোট নহে

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য—নিজের নিজের আদর্শ লইয়া তাহাই জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা। অপর ব্যক্তির আদর্শ লইয়া তদনুসারে চরিত্রগঠনের চেষ্টা হইতে উন্নতি-লাভে কৃতকার্য্য হইবার ইহা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত উপায়। অপরের আদর্শ হয়ত তিনি জীবনে কখনই পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন না। মনে কর, আমরা একটি শিশুকে একেবারে কুড়ি মাইল ভ্রমণ করিতে বলিলাম। শিশুটি হয় মরিয়া যাইবে, নয়ত বড়জোড় ঐ কুড়ি মাইল কোনপ্রকারে হামাগুড়ি দিতে দিতে শেষে অবসন্ন ও মৃতপ্রায় অবস্থায় যাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। সচরাচর আমরাও লোকের প্রতি এইরূপই করিতে গিয়া থাকি। কোন সমাজের সকল নরনারী একরূপ মন বা শক্তিবিশিষ্ট নহে, অথবা কোন বিষয় বুঝিবার সকলের একরূপ শক্তি নাই। সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকেরই আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন থাকা উচিত; আর এই আদর্শগুলির কোনটিকেই উপহাস করিবার অধিকার আমাদের নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য যতদূর পারে করুক। আমাকে তোমার বা তোমাকে আমার আদর্শের দ্বারা বিচার করা ঠিক নহে। ওক বৃক্ষের আদর্শে আপেল বা আপেল বৃক্ষের আদর্শে ওক বৃক্ষকে বিচার করা উচিত নহে। আপেল বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে আপেলের এবং ওক বৃক্ষকে বিচার করিতে হইলে ওকের নমুনা লইয়া বিচার করা আবশ্যক। এইরূপ আমাদের সকলের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির ক্রম। নরনারীর প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদ যতই থাকুক না কেন, পাশ্চাতে সেই একত্ব রহিয়াছে। আর বিভিন্ন-চরিত্র নরনারীর শ্রেণী সৃষ্টি-নিয়মের স্বাভাবিক বিভিন্নতা মাত্র। এই কারণেই এক প্রকার আদর্শের দ্বারা সকলের বিচার করা বা সকলের সম্মুখে এক প্রকারের আদর্শ স্থাপন করা কোন মতেই উচিত নয়। এইরূপ প্রণালীতে কেবল অস্বাভাবিক চেষ্টার উদ্রেক হয় মাত্র। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ আপনাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, আর তাহার ধার্ম্মিক ও সাধু হইবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন হয়। আমাদের কর্ত্তব্য—প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টা করিতে উৎসাহিত করা এবং ঐ আদর্শ সত্যের যত নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার চেষ্টা করা।

হিন্দু ধর্ম্মনীতিতে আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই তত্ত্বটি পরিগৃহীত হইয়াছে; আর তাঁহাদের শাস্ত্রে ও 'ধর্ম্মনীতি'-বিষয়ক পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই সকল বিভিন্ন আশ্রমের জন্য বিভিন্নরূপ বিধি দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে, মানবসাধারণ ধর্ম্ম ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। হিন্দুকে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা ছাত্রজীবন অবলম্বন করিতে হয়; তারপর তিনি বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়া থাকেন; বৃদ্ধাবস্থায় গৃহস্থাশ্রম

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং সর্ব্বশেষে সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন।

এইরূপ বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিভিন্ন কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই আশ্রমগুলির মধ্যে কোনটি অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। যিনি বিবাহ না করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহার জীবন যতদূর শ্রেষ্ঠ, বিবাহিত ব্যক্তির জীবন তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন নহে। সিংহাসনারূঢ় রাজা যেরূপ শ্রেষ্ঠ ও মান্য, একজন পথধূলি-পরিষ্কারকও তদ্রূপ। রাজাকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে উঠাইয়া ঝাড়ুদারের কাজ করিতে দাও—দেখ, তিনি কি করেন। আবার ঝাড়ুদারকে লইয়া সিংহাসনে বসাইয়া দাও—দেখ, সে-ই বা রাজকার্য্য কিরূপ করে। 'সংসারী হইতে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ'—বলা বৃথামাত্র। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনা করা বরং কঠিন। আজকাল ভারতে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন আশ্রমগুলি হ্রাস পাইয়া কেবলমাত্র গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই দুইটি আশ্রমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী অর্থে ধর্ম্মাচার্য্য। গৃহস্থ বিবাহ করেন এবং সামাজিক কর্ত্তব্য করিয়া যান; আর সংসারত্যাগীর কর্ত্তব্য—তাঁহার সমুদয় শক্তি কেবল ধর্ম্মের দিকে নিয়োজিত করা। তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসনা করিবেন ও ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন।

এক্ষণে তোমরা বুঝিবে, কোন্ আশ্রম কঠিন। আমি

মাহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হইতে গৃহস্থের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উপদেশগুলি পড়িব। ঐগুলি শুনিলে তোমরা দেখিবে, গৃহস্থ হওয়া ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করা বড় কঠিন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, ৮ম উল্লাস, ২৩ শ্লোক।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞানলাভই যেন তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে হইবে—তাঁহার নিজের সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। তিনি যাহা যাহা করিবেন, তাহাই তাহাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে।

কর্ম্ম করা অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা না করা—লোককে সাহায্য করা অথচ তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করা—সৎকর্ম্ম করা অথচ উহাতে তোমার নাম-যশ হইল বা না হইল এবিষয়ে একেবারে লক্ষ্য না করা—এইটিই এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। জগতের লোক যখন প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে, তখন অতি ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়। সমাজের অনুমোদন ও প্রশংসা পাইলে অতি আহাম্মক ব্যক্তিও বীরোচিত কার্য্যসকল করিতে পারে, কিন্তু নিজ প্রতিবাসীদের স্তুতি-প্রশংসা না চাহিয়া অথবা সেদিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বদা সৎকার্য্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ৮।২৪

গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য জীবিকার্জ্জন; কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন মিথ্যা কথা কহিয়া অথবা প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া উহা সংগ্রহ না করেন। আরও তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, তাঁহার জীবন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদিগের সেবার জন্য।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ৮।২৫

মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।

তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ৮।২৬

যদি মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি পরব্রহ্ম প্রীত হন।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৮।৩০-৩১

পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ

প্রকাশ করিবেন না। যে সন্তান পিতামাতাকে কখন কর্কশ কথা না বলেন, তিনি প্রকৃতপক্ষেই সৎ সন্তান। পিতামাতাকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিবেন, তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আর যতক্ষণ না তাঁহারা বসিতে অনুমতি করেন, ততক্ষণ বসিবেন না।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥ ৮।৩৩-৩৪

মাতা, পিতা, পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা, অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যে গৃহী ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করেন, তিনি পাপ করিতেছেন।

জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥ ৮।৩৬-৩৭

পিতামাতা হইতেই এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ইঁহাদের প্রীতিসাধন করা উচিত।

ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥

স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥ ৮।৩৯-৪২

* * *

যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥ ৮।৪৪

নিজ স্ত্রীর প্রতিও গৃহস্থের নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য আছে: গৃহী ব্যক্তি স্ত্রীকে কখনও তাড়না করিবেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদা মাতৃবৎ পালন করিবেন, আর যদি তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা হন তবে ঘোর কষ্টে পতিত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীকে কলুষিতচিত্তে স্পর্শ করিবেন না। এরূপ করিলে তাঁহার নরকগমন হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন বা বাস করিবেন না। স্ত্রীলোকদের নিকট অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করিবেন না এবং নিজের বাহাদুরিও দেখাইবেন না। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃততুল্য বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা স্ত্রীর সন্তোষবিধান করিবেন, কখনও তাঁহার কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। হে মহেশানি, যে ব্যক্তির উপর

পতিব্রতা ভার্য্যা তুষ্টা থাকেন, তিনি সমুদয় ধর্ম্ম করিয়াছেন এবং তিনি তোমার প্রিয়।

চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেষয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ৮।৪৫-৪৭

পুত্রকন্যার প্রতি গৃহস্থের নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য: চারি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রগণকে লালনপালন করিবেন, পরে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত নানাবিধ সদ্‌গুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, তারপর তাহাদিগকে আত্মতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিবেন। এইরূপে কন্যাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

এবংক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বসৄভ্রাতৄসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্ গৃহী ॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥ ৮।৪৮-৫০

গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা-ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন ও তাহাদের সন্তোষবিধান করিবেন। তৎপরে গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্মনিরত একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনগণকে প্রতিপালন করিবেন। হে দেবি! বিভব সত্ত্বেও যদি গৃহস্থ এতদ্রূপ আচরণ না করেন, তবে তাঁহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে; তিনি লোকসমাজে নিন্দনীয় ও পাপী।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ৮।৫১-৫২

গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশ-বিন্যাস এবং অশনবসনে আসক্তি ত্যাগ করিবেন। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, মৈথুন এই সকলই পরিমিতভাবে করিবেন। তিনি অকপট, নম্র, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্ন, নিরালস্য ও উদ্যোগশীল হইবেন।

শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ। ৮।৫৩

গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শূরতার অবলম্বন করিবেন এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকিবেন।

শত্রুগণকে বীর্য্যপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে। ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহস্থকে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিলে আর 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' বলিয়া বাজে

বকিলে চলিবে না। যদি তিনি শত্রুগণের নিকট শৌর্য্য প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যের অবহেলা করা হয়। কিন্তু তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও গুরুর নিকট তাঁহাকে মেষতুল্য শান্ত নিরীহ ভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ ৮।৫৩

নিন্দিত অসৎ ব্যক্তিদিগকে সম্মান দিবেন না এবং সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিগণকেও অবমাননা করিবেন না।

অসৎ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা গৃহী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহাতে অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আবার যাঁহারা সম্মানের যোগ্য, তাঁহাদিগকে তিনি যদি সম্মান না করেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে মহা অন্যায়।

সৌহার্দ্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ ॥ ৮।৫৪

সহবাস ও সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা লোকের বন্ধুত্ব, ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া তবে তাহাদের উপর বিশ্বাস করিবেন।

যাহার-তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবেন না, যেখানে-সেখানে যাইয়া লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবেন না। প্রথমতঃ যাঁহাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, সেইগুলি বিচারপূর্ব্বক আলোচনা করিবেন—তাহার পর বন্ধুত্ব করিবেন।

স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে কেহই ছোট নহে

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।

কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৮।৫৬

ধর্ম্মজ্ঞ গৃহী ব্যক্তি নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয়, অপরের কথিত গুপ্তকথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

তাঁহার নিজেকে দরিদ্র বা ধনী কিছুই বলা উচিত নহে। তাঁহার নিজের ধনের গর্ব্ব করা উচিত নয়। ঐ বিষয় তাঁহার গোপনে রাখা উচিত। ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম। ইহা শুধু সাংসারিক বিজ্ঞতা নহে; যদি কেহ এরূপ না করেন, তাঁহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলা যাইতে পারে।

গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি; তিনিই প্রধান উপার্জ্জক। দরিদ্র, দুর্ব্বল, বালক-বালিকা, স্ত্রীলোক—যাহারা কোন কার্য্য করে না—সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে; আর সেই কর্ত্তব্যগুলি এমন হওয়া উচিত যেন সেইগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন এবং এরূপ মনে না করেন যে, তিনি নিজ আদর্শের অনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন না। এই কারণে—

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেহপি পরাজয়ে।

গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ ৮।৫৭

যদি তিনি কোন অন্যায় বা নিন্দিত কার্য্য করিয়া থাকেন, অথবা এমন কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, যাহাতে

তিনি অকৃতকার্য্য হইবেন নিশ্চিত জানেন, সে বিষয়েও তাঁহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নহে। এইরূপে আত্মদোষ-প্রকাশের কোনও প্রয়োজন ত নাই-ই, অপর দিকে আবার উহাতে তাঁহার নিরুৎসাহ আসিয়া তাঁহাকে যথাযথ কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দেয়। তিনি যে অন্যায় করিয়াছেন, তজ্জন্য ত তাঁহাকে ভুগিতেই হইবে; কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে তিনি ভাল করিতে পারেন। জগৎ সর্ব্বদা শক্তিমান্ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের সহিতই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ॥ ৮।৫৮

যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে এবং ব্যসন (দ্যূতক্রীড়াদি), অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও পরহিংসা পরিত্যাগ করিবে।

তাঁহাকে প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে ধনোপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার কর্ত্তব্য, আর যদি তিনি তাঁহার এই কর্ত্তব্য সাধন না করেন, তাঁহাকে ত মানুষ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে না। যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করেন, তাঁহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে। যদি তিনি অলসভাবে জীবনযাপন করেন ও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকে অসৎপ্রকৃতি বলিতে হইবে; কারণ তাঁহার উপর সহস্র

সহস্র ব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। যদি তিনি যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করেন, অপর শত শত ব্যক্তির তাহাতে ভরণপোষণ হইবে।

যদি এই সহরে শত শত ব্যক্তি ধনী হইবার চেষ্টা করিয়া ধনী না হইতেন, তাহা হইলে এই সভ্যতা, দরিদ্রালয় এবং বড় বড় বাড়ী কোথায় থাকিত?

এ ক্ষেত্রে অর্থোপার্জ্জন অন্যায় নহে, কারণ ঐ অর্থ বিতরণের জন্য। গৃহস্থই সমাজের কেন্দ্র। অর্থোপার্জ্জন ও তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করাই তাঁহার পক্ষে উপাসনা। কারণ যে গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছেন, সন্ন্যাসী নিজ কুটীরে বসিয়া উপাসনা করিলে যেমন তাঁহার মুক্তিলাভের সহায়তা হইয়া থাকে, গৃহস্থেরও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। যেহেতু উভয়েতেই আমরা ঈশ্বর ও ঈশ্বরের যাহা কিছু তৎসমুদায়ের উপর ভক্তিভাব-প্রণোদিত আত্মনির্ভর ও আত্মত্যাগরূপ একই ধর্ম্মের বিভিন্ন বিকাশ দেখিতেছি।

অনেক সময় লোকে আপনাদের সাধ্যাতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আর তার ফল এই হয় যে, তাহারা নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য অপরকে প্রতারণা করিয়া থাকে।

আবার—

অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ৮।৫৯

চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত। অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম্ম করিবে।

সকল বিষয়েই এই 'সময়ের' দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক সময়ে যাহা অসিদ্ধ হইল, অপর সময়ে হয়ত তাহাতে সম্পূর্ণ সাফল্য ঘটিল।

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮।৬২

ধীর গৃহস্থ ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেন। তিনি নিজের যশ খ্যাপন করিবেন না এবং পরের নিন্দা পরিত্যাগ করিবেন।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৮।৬৩

যে ব্যক্তি জলাশয়খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রাম-গৃহ ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠা ও উৎসর্গ করেন, তিনি ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকেন।

বড় বড় যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও এই সকল কর্ম্ম করিয়া সেই পদলাভের প্রতিই অগ্রসর হইতে থাকেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম-যোগের যাবতীয় নীতিরাজিকে কার্য্যে পরিণত করাই গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ম্ম-যোগের ইহাই এক অংশ—সর্ব্বদা ক্রিয়াশীলতা—ইহাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

উক্ত তন্ত্রগ্রন্থেই আর কিছু পরে অপর একটি শ্লোক দৃষ্ট হয় :

ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৮।৬৭

যিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বা যিনি ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন।

যদি স্বদেশের বা স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা যে পদ লাভ করেন, তিনিও সেই পদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে এইটি স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, একজনের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, অপরের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু শাস্ত্র কোনটিকেই হীন বা উন্নত বলিতেছেন না। বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রে বিভিন্ন কর্ত্তব্য রহিয়াছে; আর আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, আমাদিগকে তদুপযোগী কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে।

এই সমুদয়ের নিষ্কর্ষ করিয়া এই এক ভাব পাওয়া যাইতেছে যে, দুর্ব্বলতা মাত্রই সর্ব্বথা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। আমাদের দর্শন, ধর্ম্ম বা কর্ম্মের ভিতর—আমাদের সমুদয় শাস্ত্রীয় শিক্ষার ভিতর—এই বিশেষ ভাবটি আমি খুব পছন্দ করি। যদি তোমরা বেদ পাঠ কর তাহা হইলে দেখিবে, তাহাতে 'অভয়' এই শব্দটী বার বার উক্ত হইয়াছে। কিছুতেই ভয় করিও না—ভয় দুর্ব্বলতার চিহ্ন; আর এই দুর্ব্বলতাই মানবকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া নানা পাপ-কর্ম্মে

টানিয়া লয়। সুতরাং জগতের ঘৃণা ও উপহাসের দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া অকুতোভয়ে স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে।

যদি কেহ সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নহে যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া সংসারের হিত চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, আবার যাঁহারা সংসারের স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য রহিয়াছেন তাঁহারা যেন সংসারত্যাগীদিগকে আলস্যপরায়ণ ঘৃণিত জীব মনে না করেন। নিজ নিজ অধিকারে কেহই ছোট নহে।

এই বিষয়টী আমি একটি গল্প দ্বারা বুঝাইব। কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে যে কোন সন্ন্যাসী আসিতেন, তাঁহাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন—'যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে শ্রেষ্ঠ, না যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্ত্তব্য করিয়া যায় সে-ই শ্রেষ্ঠ?' অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, 'সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ'। রাজা এই বাক্যের প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার আদেশ দিলেন। আবার অপর কতকগুলি ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, 'স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ।' রাজা তাঁহাদের নিকটও প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা তাহা দিতে পারিলেন না,

তখন তাঁহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া আপনার রাজ্যে বাস করাইলেন।

অবশেষে তাঁহার নিকট এক যুবা সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রাজা তাঁহার নিকটেও উপর্যুক্ত প্রশ্ন করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন, "হে রাজন, নিজ নিজ অধিকারে উভয়েই শ্রেষ্ঠ, কেহই ন্যূন নহেন।" রাজা বলিলেন, "ইহার প্রমাণ দিন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, আমি প্রমাণ দিব। তবে কিছু দিন আপনাকে আমার মত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই আমার বাক্য আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব।" রাজা সম্মত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর এক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহাসমারোহ-ব্যাপার চলিতেছিল। রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি এবং ঘোষণাকারিগণের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে—আর ঢেঁটরা পেটা হইতেছে। রাজা ও সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাপারটা কি! ঘোষণাকারী চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "এই দেশের রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন।"

ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপে রাজকন্যাগণের স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশ্য প্রত্যেক রাজ-কন্যারই, তিনি কিরূপ বর মনোনীত করিবেন, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ভাব ছিল। কাহারও কাহারও ভাব—বর যেন

পরম সুন্দর হয়, কাহারও কেবল অতিশয় বিদ্বান্ বরের আকাঙ্ক্ষা, কেহ কেহ আবার খুব ধনী বরের আকাঙ্ক্ষা করিতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজকন্যা অতিশয় চাকচিক্য-শালী শোভাময় বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইয়া একটি সিংহাসনে বাহিতা হইতেন, আর ঘোষণাকারীরা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিত—অমুক রাজকন্যা এইবারে স্বয়ম্বরা হইবেন। তখন নিকটবর্ত্তী সকল রাজ্যের রাজপুত্রগণ শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখীন হইতেন। কখন কখন তাঁহাদেরও ঘোষণাকারী থাকিত; তাঁহারা তাঁহার গুণাবলী—কিসে তিনি রাজকন্যার মনোনিত হইবার যোগ্যপাত্র—তাহা বর্ণন করিত। রাজকন্যাকে চতুর্দ্দিকে বহিয়া লইয়া যাওয়া হইত—তিনি সমবেত রাজপুত্রগণের এক এক জনের দিকে দেখিতেন, আর কে কিরূপ গুণশালী, তাহা শুনিতেন। যদি তাহাতে তাঁহার সন্তোষ না হইত, তিনি বাহকদিগকে বলিতেন, 'এখান হইতে চল'; তখন সেই প্রত্যাখ্যাত রাজতনয়াকাঙ্ক্ষীর দিকে আর কেহ চাহিয়া দেখিত না। কিন্তু যদি রাজকন্যা ইঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি মন সমর্পণ করিতেন, তবে তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতেন এবং তদবধি তিনিই তাঁহার স্বামী হইতেন।

যে দেশে আমাদের পূর্ব্ব-কথিত রাজা ও সন্ন্যাসী আসিয়া-ছেন সেই দেশের রাজকন্যার এরূপ স্বয়ম্বর হইতেছিল। এই রাজকন্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন; আর

এই পণ ছিল যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রাজা হইবেন। এই রাজকন্যার ইচ্ছা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পুরুষকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার মনের মত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুরুষ পাইতেছিলেন না। অনেকবার এইরূপ স্বয়ম্বর সভা আহূত হয়, তথাপি রাজকন্যা কাহাকেও মনোনিত করেন নাই। যতগুলি স্বয়ম্বর-সভা হইয়াছিল, তন্মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা মহৎ ও বৃহৎ হইয়াছিল। এই সভায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষা অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল, আর এই সভার দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভুত হইয়াছিল!

রাজকন্যা সিংহাসনে করিয়া আসিলেন ও বাহকগণ দ্বারা সভামধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাহিতা হইতে লাগিলেন। রাজকন্যা কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এবারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত কেহই মনোনিত হইবেন না ভাবিয়া সকলেই বিমর্ষ হইতে লাগিলেন। এমন সময় এক যুবা সন্নাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রূপের প্রভা দেখিয়া বোধ হইল, যেন স্বয়ং সূর্য্যদেব আকাশমার্গ ছাড়িয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সভার এককোণে দাঁড়াইয়া কি হইতেছে দেখিতে লাগিলেন। রাজকন্যাসহ সেই সিংহাসন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। রাজকন্যা সেই পরমরূপবান সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র বাহকদিগকে দণ্ডায়মান হইতে বলিয়া সন্নাসীর গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। যুবা সন্ন্যাসীটি মালা লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "একি পাগলামি

করিতেছে ? আমি সন্ন্যাসী, বিবাহের সহিত আমার সম্পর্ক কি ?" সেই দেশের রাজা মনে করিলেন, বোধ হয় লোকটি দরিদ্র, সেই জন্য রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ভরসা করিতেছে না ; অতএব বলিলেন, "তুমি এক্ষণে আমার কন্যার সহিত অর্দ্ধ রাজ্য পাইবে এবং আমার মৃত্যুর পর সমুদয় রাজ্য পাইবে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর গলদেশে আবার মাল্য অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসী "কি উৎপাৎ! আমি বিবাহ করিতে চাহি না, তবু এ কি ?" বলিয়া পুনরায় মালা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে এই যুবকটির প্রতি রাজকন্যার এতদূর ভালবাসা পড়িয়াছিল যে, তিনি বলিলেন, "হয় আমি ইহাকে বিবাহ করিব—নয় মরিব।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার অনুবর্ত্তন করিলেন। তখন সেই অপর সন্ন্যাসী—যিনি রাজাকে এখানে আনিয়াছিলেন—রাজাকে বলিলেন, "চলুন, আমরা এই দুইজনের অনুগমন করি।" এই বলিয়া তাঁহারা অনেকটা দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। যে সন্ন্যাসী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তিনি রাজধানী হইতে বাহির হইয়া কয়েক মাইল ধরিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বনে প্রবেশ করিলেন। রাজকন্যাও তাঁহার অনুগমন করিলেন ; অপর দুই জনও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী ঐ বনটিকে তন্ন তন্ন রূপে জানিতেন ;

উহার কোথায় কি গুপ্ত পথ আছে, উহার অন্ধি-সন্ধি সমস্তই জানিতেন। সন্ধ্যা-সমাগমে হঠাৎ তিনি এইরূপ একটি পথে প্রবেশ করিয়া একেবারে অন্তর্হিত হইলেন। রাজকন্যা আর তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া তিনি একটি বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কারণ তিনি সেই বন হইতে বাহিরে আসিবার পথ জানিতেন না। তখন সেই রাজা ও অপর সন্ন্যাসীটি তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, "কাঁদিও না, আমরা তোমাকে এই বনের বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব। কিন্তু এখন পথ বাহির করা বড় কঠিন; কারণ এখন বড় অন্ধকার। এই একটা বড় গাছ রহিয়াছে; এস, আজ ইহার তলায় বিশ্রাম করা যাক। প্রভাত হইলেই তোমাকে বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিব।"

সেই গাছে এক পাখীর বাসা ছিল। তাহাতে একটি ছোট পক্ষী, পক্ষিণী ও তাহাদের তিনটি ছোট ছোট শাবক থাকিত; ছোট পাখীটি নীচের দিকে চাহিয়া তিনটি লোককে গাছের তলায় দেখিল ও পক্ষিণীকে বলিল, "দেখ, কি করা যায়? আমাদের ঘরে অনেকগুলি অতিথি আসিয়াছেন—এ শীতকাল, আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।" এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোঁটে করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহার অতিথিগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা সেই অগ্নিখণ্ডে জ্বালানি-কাষ্ঠ যোগ করিয়া বেশ আগুন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পক্ষীটির তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। সে

তাহার পত্নীকে বলিল, "প্রিয়ে, আমরা কি করি? ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার মত আমাদের ঘরে কিছুই নাই; কিন্তু ইঁহারা ক্ষুধার্ত্ত, আর আমরা গৃহস্থ; ঘরে যে কেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। আমি নিজে যতদূর পারি করিব। আমি ইঁহাদিগকে আমার নিজ শরীর দিব।" এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া বেগে অগ্নিতে পড়িল ও মরিয়া গেল। অতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, তাহাকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িয়া মরিয়া গেল যে, তাঁহারা উহাকে নিবারণ করিবার সময় পাইলেন না।

পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য্য দেখিল এবং বলিল, "তিনজন লোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের খাইবার জন্য একটি ছোট পক্ষী মাত্র রহিয়াছে। ইহাতে ত কুলাইবে না। স্ত্রীর কর্ত্তব্য— স্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমিও আমার শরীর সমর্পণ করি।" এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল ও পুড়িয়া মরিয়া গেল।

তারপর সেই শাবক তিনটি সমুদয় দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্য্যাপ্ত খাদ্য হয় নাই দেখিয়া বলিল, "আমাদের পিতামাতা যতদূর সাধ্য করিলেন, কিন্তু তাহাও ত পর্য্যাপ্ত হইল না। পিতামাতার কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সন্তানের কর্ত্তব্য; অতএব আমাদেরও শরীর যাউক।" এই বলিয়া তাহারাও সকলে অগ্নিতে ঝাঁপ দিল।

ঐ তিন ব্যক্তি কিন্তু পক্ষীগুলিকে খাইতে পারিলেন না; তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং কোনরূপে অনাহারে রাত্রিযাপন করিলেন। প্রভাত হইলে রাজা ও সন্ন্যাসী সেই রাজকন্যাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। তখন তিনি তাঁহার পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তখন সন্ন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন্, দেখিলেন নিজ নিজ অধিকারে কেহই অপর হইতে নিকৃষ্ট নহে। যদি আপনি সংসারে থাকিতে চান, তবে ঐ পক্ষিগণের ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে অপরের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি আপনি সংসারত্যাগ করিতে চান, তবে ঐ যুবকের ন্যায় হউন, যাহার পক্ষে পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা ও রাজ্য-ধন শূন্যবৎ প্রতিভাত হইয়াছিল। যদি আপনি গৃহস্থ হইতে চান, তবে আপনার জীবনকে অপরের হিতের জন্য সর্ব্বদা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকুন। আর যদি আপনি সন্ন্যাস-জীবনকেই মনোনীত করেন তবে সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও শক্তির দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করিবেন না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু একজনের কর্ত্তব্য অপরের কর্ত্তব্য নহে।"

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মরহস্য

অপরের দৈহিক অভাব পূরণ করিয়া তাহাকে সাহায্য করা মহৎ কর্ম্ম বটে, কিন্তু অভাব যত অধিক এবং সাহায্য বা উপকার যত অধিকদূরস্পর্শী, সেই অনুসারে সেই উপকারও উচ্চতর। যদি এক ঘণ্টার জন্য কোন ব্যক্তির অভাব দূর করিতে পারা যায়, তাহা তাহার পক্ষে অবশ্য উপকার বলিতে হইবে, কিন্তু যদি এক বৎসরের জন্য অভাব দূর করিতে পারা যায়, তাহা আরও অধিক উপকার; আর যদি চিরকালের জন্য অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহাই মানুষের সর্ব্বোচ্চ সাহায্য বা উপকার। অধ্যাত্মজ্ঞানই একমাত্র বস্তু, যাহা আমাদের সমুদয় কষ্ট চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে; অপরাপর জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র। মানুষের প্রকৃতি যদি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তবেই তাহার অভাব চিরকালের জন্য দূরীভূত হইতে পারে। কেবল আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই অভাব-বৃত্তির একেবারে বিনাশ সঙ্ঘটিত হইতে পারে, অতএব মানুষকে আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা—আর মানুষকে যিনি পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান

করিতে পারেন, তিনিই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী। আমরা দেখিতেও পাই, মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিবার জন্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাই খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন; কারণ আধ্যাত্মিকতাই জীবনের অন্যান্য কার্য্যসমূহের ভিত্তি। আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও সবলতা-সম্পন্ন মানব যদি ইচ্ছা করেন, অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ হইতে পারেন; আর মানুষের ভিতর আধ্যাত্মিক বল না আসিলে, তাহার শারীরিক অভাবগুলি পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক পূরণ হয় না। আধ্যাত্মিক উপকারের পরই হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি-সম্বন্ধে সাহায্য করা। জ্ঞানদান ভোজ্য-বস্ত্রদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান—প্রাণদান হইতেও উহা শ্রেষ্ঠ; কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন। অজ্ঞান মৃত্যুতুল্য; জ্ঞানই জীবন। জীবন যদি কেবল অন্ধকারময় এবং অজ্ঞান ও দুঃখের মধ্য দিয়া কষ্টে-সৃষ্টে চলা মাত্র হয়, তবে জীবনের মূল্য অতি অল্প। তারপর অবশ্য শারীরিক অভাবপূরণে সাহায্যদান। অতএব 'পরোপকার' সম্বন্ধে বিচার করিবার সময় যেন আমরা এই ভ্রমে পতিত না হই যে, শারীরিক সাহায্যই একমাত্র সাহায্য। শারীরিক সাহায্য সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বনিম্নে, কারণ উহাতে চিরতৃপ্তি নাই। ক্ষুধার্ত্ত হইলে যে কষ্ট হয় তাহা খাইলেই চলিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে। কষ্ট তখনই দূর হইবে যখন আমার সর্ব্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না—কোনরূপ দুঃখ কষ্ট বা যাতনা আমাকে

চঞ্চল করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব যাহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন করে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার; তাহার পর মানসিক উপকার; তাহার পর শারীরিক।

কেবল শারীরিক সাহায্য দ্বারা জগতের দুঃখ দূর করা অসম্ভব। যতদিন না মানুষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ততদিন এই শারীরিক অভাবসকল আসিবেই আসিবে—ততদিন এই কষ্টগুলি বোধ হইবেই হইবে। যতই শারীরিক সাহায্য কর না কেন, কোনমতেই কষ্ট একেবারে দূর হইবে না। জগতের এই দুঃখ-সমস্যার একমাত্র মীমাংসা—মানবজাতিকে পবিত্র করা। আমরা জগতে যাহা কিছু দুঃখ, কষ্ট ও অশুভ দেখিতে পাই, অজ্ঞানই তৎসমুদয়ের জনক। মানুষকে জ্ঞানালোক দাও, মানুষকে আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন কর। যদি আমরা ইহা করিতে সমর্থ হই—যদি সকল মানুষ পবিত্র, আধ্যাত্মিক-বলসম্পন্ন ও শিক্ষিত হয়, কেবল তাহা হইলেই জগৎ হইতে দুঃখ চলিয়া যাইবে, তাহার পূর্ব্বে দুঃখ যাইতেই পারে না। দেশে যত বাড়ী আছে, সকলগুলিকে আমরা দান-ভাণ্ডার করিয়া তুলিতে পারি, দেশকে হাসপাতালে হাসপাতালে ছাইয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যতদিন না মানুষের স্বভাব বদলাইতেছে, ততদিন কষ্ট থাকিবেই থাকিবে।

আমরা গীতায় পুনঃ পুনঃ শিক্ষা পাই—আমাদিগকে অনবরত কর্ম্ম করিতে হইবে; কিন্তু সকল কর্ম্মই সদসৎমিশ্রিত। আমরা এমন কোন কর্ম্ম করিতে পারি না, যাহার কোনখানে

কিছু ভাল নাই; আবার এমন কোন কর্ম্ম হইতে পারে না, যাহাতে কোথাও কাহারও না কাহারও কিছু অনিষ্ট না করিবে। প্রত্যেক কার্য্যই অনতিক্রমণীয় ভাবে সদসৎ-মিশ্রিত। তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে বলিতেছেন। সদসৎ উভয়ই উহাদের ফলপ্রসব করিবে। সৎকর্ম্মের ফল সৎ, অসৎ কর্ম্মের ফল অসৎ হইবে; কিন্তু এই সদসৎ উভয়ই আত্মার বন্ধনমাত্র। গীতায় এ তত্ত্বের এই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, যদি আমরা কর্ম্মে আসক্ত না হই, তবে উহা আমাদের উপর কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারিবে না। এক্ষণে 'কর্ম্মে অনাসক্তি' বলিতে কি বুঝায়, আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

গীতার মূলসূত্রই এই—নিরন্তর কর্ম্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না। 'সংস্কার' শব্দে মনের যেদিকে বিশেষ ঝোঁক, তাহা বুঝাইয়া থাকে। মনকে যদি একটি হ্রদের সহিত তুলনা করা যায় তবে বলা যায় যে, মনের মধ্যে যে কোন তরঙ্গ উঠে তাহার বিরাম হইলেও তাহা একেবারে নাশ হইয়া যায় না, কিন্তু উহা চিত্তের ভিতর একটি দাগ এবং সেই তরঙ্গটির উদয় হইবার পুনঃসম্ভাবনীয়তা রাখিয়া যায়। এই দাগ এবং ঐ তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনীয়তার একত্রে নাম—সংস্কার। আমরা যে কোন কার্য্য করি—আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালন, আমাদের মনের প্রত্যেক চিন্তা চিত্তের উপর এইরূপ সংস্কার ফেলিয়া যাইতেছে; আর যখন তাহারা উপরিভাগে প্রকাশিত না থাকে, তখনও তাহারা এত প্রবল থাকে যে, তলে তলে

অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতে থাকে। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা, তাহা আমাদের মনের উপর এই সংস্কারপুঞ্জের দ্বারা নিয়মিত। আমি এই মুহূর্ত্তে যাহা, তাহা আমার ভূত-জীবনের এই সকল সংস্কার-সমষ্টিমাত্র। ইহাকেই প্রকৃতপক্ষে চরিত্র বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র এই সংস্কার-সমষ্টির দ্বারা নিয়মিত। যদি শুভ সংস্কার প্রবল হয়, সেই চরিত্র সাধু-চরিত্ররূপে পরিণত হয়, অসৎ সংস্কার প্রবল হইলে তাহা অসচ্চরিত্র হয়। যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা মন্দ কথা শুনে, মন্দ চিন্তা করে, মন্দ কাজ করে, তাহার মন এই সকল মন্দসংস্কারে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং উহারাই অজ্ঞাতসারে তাহার কার্য্য-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবে। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বদাই এই সংস্কারগুলির কার্য্য হইতেছে। সুতরাং সে ব্যক্তির মন্দসংস্কার-সম্পন্ন হওয়ায় তাহার কার্য্যও মন্দ হইবে—সে একটি মন্দ লোক হইয়া দাঁড়াইবে—সে তাহা না হইয়া থাকিতে পারিবে না। এই সংস্কার-সমষ্টি মন্দ কার্য্য করিবার প্রবল প্ররোচক শক্তি-স্বরূপ হইবে। সে এই সংস্কারগুলির হস্তে যন্ত্রতুল্য হইবে, তাহারা তাহাকে জোর করিয়া মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে। এইরূপ, যদি কোন লোক ভাল বিষয় ভাবে এবং ভাল কাজ করে, উহাদের সংস্কারগুলির সমস্ত ভালই হইবে এবং উহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাহাকে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে। যখন মানুষ এত ভাল কাজ করে এবং এত সৎ চিন্তা করে যে, তাহার প্রকৃতিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও

অনিবার্য্যরূপে সৎ কার্য্য করিবার ইচ্ছা উপস্থিত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য্য করিব বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেও ঐ সকল সংস্কারের সমষ্টি-স্বরূপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না—সংস্কারগুলিই তাহাকে মন্দ দিক হইতে ফিরাইয়া আনিবে। সে তখন তাহার সৎ সংস্কারের হস্তে পুত্তলিকাপ্রায়। যখন এইরূপ হয় তখনই সেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।

যেমন কূর্ম্ম তাহার পদ ও মস্তক খোলার ভিতরে গুটাইয়া রাখে—তুমি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পার, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু তাহারা বাহিরে আসিবে না—যে ব্যক্তির বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কেন্দ্রগুলির উপর সংযমলাভ হইয়াছে, তাহার চরিত্রও সেইরূপ। সর্ব্বদা সচ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা শুভ সংস্কারগুলি তাহার মনের উপরিভাগে সর্ব্বদা ভ্রমণ করাতে চিত্তের শুভ সংস্কার প্রবল হয়; তাহার ফল এই হয় যে, আমরা ইন্দ্রিয় (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই) জয় করিতে সমর্থ হই। তখনই চরিত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই কেবল তুমি সত্যলাভ করিতে পার। এরূপ লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়। তাহার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য সম্ভবে না। তাহাকে যেখানেই ফেলিয়া দাও না কেন, যে সঙ্গেই তাহাকে রাখ না কেন, তাহার পক্ষে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এই শুভসংস্কারসম্পন্ন হওয়া অপেক্ষা আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে—মুক্তির বাসনা। তোমাদের স্মরণ

রাখা উচিত যে, এই সকল বিভিন্ন যোগের লক্ষ্য—আত্মার মুক্তি। প্রত্যেকেই সমভাবে একই স্থানে লইয়া যায়। বুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা বা খ্রীষ্ট প্রার্থনা দ্বারা যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, মানুষ কেবল কর্ম্মের দ্বারাও সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন জ্ঞানী, আর খ্রীষ্ট ছিলেন ভক্ত; কিন্তু উভয়ে সেই একই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইটুকুই বুঝা কঠিন যে, মুক্তি অর্থে একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—শুভ বন্ধন হইতে যেমন, অশুভের বন্ধন হইতেও তেমনি মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও শিকল। আমার অঙ্গুলিতে একটি কাঁটা ফুটিয়াছে, আমি আর একটি কাটা দ্বারা ঐ কাঁটাটি তুলিলাম। তোলা হইয়া গেলে দুইটি কাঁটাই ফেলিয়া দিলাম। দ্বিতীয় কাঁটাটি রাখিবার দরকার নাই, কারণ উভয়টিই কাঁটা তো বটে। এইরূপ অশুভ সংস্কারগুলি শুভ সংস্কার দ্বারা নাশ করিতে হইবে। মনের মন্দ দাগগুলি তুলিয়া উহার উপর ভাল দাগ ফেলিতে হইবে—যতদিন না যাহা কিছু মন্দ প্রায় অন্তর্হিত হইয়া যায় অথবা জিত হয় অথবা মনের এক কোণে বশীভূত ভাবে থাকে। কিন্তু তৎপরে শুভ সংস্কারগুলিকেও জয় করিতে হইবে। তখনই যে 'আসক্ত' ছিল, সে 'অনাসক্ত' হইয়া যায়। কার্য্য কর, কিন্তু যেন ঐ কার্য্য বা চিন্তা মনের উপর প্রবলভাবে কোন সংস্কার ফেলিয়া না যায়। তরঙ্গ আসুক, পেশী ও মস্তিষ্ক হইতে মহৎ মহৎ কার্য্য বাহির হউক, কিন্তু তাহারা যেন আত্মার উপর গভীর

দাগ রাখিয়া যাইতে না পারে। ইহা করিবার উপায় কি? আমরা দেখিতে পাই, যে কার্য্যে আমরা আপনাদিগকে মিশ্রিত করি, তাহারই সংস্কার থাকিয়া যায়।

সমস্ত দিন আমার সহিত শত শত লোকের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার সহিতও আমার সাক্ষাৎ হইল। রাত্রে যখন আমি শয়ন করিতে গেলাম, তখন আমি আমার দৃষ্ট সমুদয় মুখগুলির বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এক মিনিটের জন্য যে মুখখানি দেখিয়াছিলাম, যাহাকে আমি ভালবাসিতাম সেই মুখখানিই আমার নিকটে আসিল, অপরগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। আমার ঐ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ আসক্তিবশতঃ অন্যান্য মুখগুলি অপেক্ষা এইটিই আমার মনে বিশেষ কার্য্য করিয়াছিল। শরীর সম্বন্ধে ঐ সকলগুলিরই একরূপ প্রভাব বলিতে হইবে। যে মুখগুলি আমি দেখিয়াছি, সকলগুলিরই ছবি আমার অক্ষিজালের * উপর পড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক ঐ ছবি লইয়াছিল, তথাপি মনের উপর উহাদের প্রভাব একরূপ হয় নাই; কিন্তু এত ব্যক্তির চকিত দর্শনমাত্র আমার চিত্তের মধ্যে এতদূর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, অন্যান্য মুখগুলির সহিত আমার চিত্তাভ্যন্তরস্থ কোন ভাবের

---

* অক্ষিজাল— Retina; চক্ষুর্গোলকের পশ্চাদ্ভাগস্থ কোমল পদার্থবিশেষ। ঐ স্থানে চাক্ষুষ স্নায়ুসূত্রগুলি শেষ হইয়াছে। উহার উপর বস্তুর চিত্র পতিত হইয়া চাক্ষুষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সাদৃশ্য ছিল না, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি হয় ত সম্পূর্ণ নূতন—এমন সকল নূতন মুখ হয়ত দেখিয়াছি, যাহাদের সম্বন্ধে আমি কখন চিন্তাই করি নাই; কিন্তু যে মুখখানির একবার মাত্র চকিত দর্শন পাইয়াছি, তাহার সহিত চিত্তাভ্যন্তরস্থ বিষয়ের বিশেষ সংস্রব ছিল। হয়ত কত বৎসর ধরিয়া তাহার ছবি ভাবিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত বিষয় জানিতাম, আর এই একবার দর্শনরূপ নূতন বিষয় মনের ভিতরকার শত শত সদৃশ বিষয় পাইল ও তাহাতেই ঐ সকল সম্বন্ধ জাগরিত হইয়া উঠিল। এই বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার পড়িল, ঐ একখানি মুখ দেখিয়া মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ সংস্কার পড়িল। সেই কারণেই উহা মনের উপর সহজেই এত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

অতএব অনাসক্ত হও, কার্য্য চলিতে থাকুক—মস্তিষ্ককেন্দ্র-সমূহ কার্য্য করুক—নিরন্তর কার্য্য করুক, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে জয় না করিতে পারে। তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য আসিয়াছ, এই ভাবে কার্য্য করিয়া যাও। নিরন্তর কার্য্য কর, কিন্তু নিজেকে যেন বন্ধনে ফেলিও না; বন্ধন বড় ভয়ানক। এই জগৎ আমাদের বাসভূমি নহে। আমাদের নানা সোপানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, জগৎও তদ্রূপ একটি সোপান-বিশেষ; ইহার মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি মাত্র। সাংখ্যের সেই মহাবাক্য স্মরণ রাখিও—"সমুদয় প্রকৃতি আত্মার জন্য, আত্মা প্রকৃতির জন্য নহে।"

প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজন আত্মার শিক্ষার জন্য, প্রকৃতির অন্য কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজনই এই যে, আত্মা যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে—আর জ্ঞানের দ্বারাই আত্মা আপনাকে মুক্ত করিতে পারে। আমরা যদি সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখি, তবে আমরা প্রকৃতিতে কখনই আসক্ত হইব না; আমরা জানিব, প্রকৃতি আমাদের একটি পাঠ্যপুস্তক মাত্র। উহা হইতে জ্ঞানলাভ করিবার পর, ঐ গ্রন্থের আর আমাদের নিকট কোন মূল্য থাকে না। তাহা না করিয়া আমরা প্রকৃতির সহিত আপনাদিগকে মিশাইয়া ফেলিতেছি—আমরা ভাবিতেছি, আত্মাই প্রকৃতির জন্য; যেমন সাধারণ চলিত কথা আছে যে, 'কেহ কেহ খাইবার জন্যই জীবনধারণ করিয়া থাকে, কেহ আবার জীবনধারণ করিবার জন্য খাইয়া থাকে।' আমরা সর্ব্বদাই এই ভুল করিতেছি। আমরা প্রকৃতিকে 'আমি' ভাবিয়া ভ্রমে পড়িতেছি, আর উহাতে আসক্ত হইতেছি। এই আসক্তি হইতেই আত্মার উপর প্রবল সংস্কার পড়িতেছে। উহাতেই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দাসবৎ কার্য্য করাইতেছে।

মোট কথা হইতেছে এই যে, প্রভুর মত কাজ করিতে হইবে, ক্রীতদাসের মত নয়। কার্য্য সর্ব্বদা কর, কিন্তু দাসের মত কার্য্য করিও না। সকলে কেমন কার্য্য করিতেছে, তাহা কি দেখিতেছ না? কেহই ইচ্ছাসত্ত্বেও বিশ্রামলাভ করিতে পারে না। শতকরা নিরানব্বই জন লোক দাসবৎ কার্য্য করিয়া থাকে—

তাহার ফল দুঃখ; ঐরূপ কার্য্য স্বার্থপর। স্বাধীনতার সহিত কার্য্য কর, প্রেমের সহিত কার্য্য কর। প্রেম শব্দটি বুঝা বড় কঠিন। স্বাধীনতা না থাকিলে প্রেম আসিতেই পারে না। ক্রীতদাসের ত প্রেম নাই-ই। একটি ক্রীতদাস কিনিয়া শিকলে বাঁধিয়া যদি তাহাকে কাজ করাও, সে বাধ্য হইয়া কষ্টে-সৃষ্টে কাজ করিবে বটে, কিন্তু তাহার প্রেম থাকিবে না। এইরূপ যখন আমরা জগতের জন্য দাসবৎ কার্য্য করি, তাহাতেও আমাদের প্রেম থাকে না, সুতরাং তাহা প্রকৃত কার্য্য নহে। আমাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের জন্য আমরা যে কাজ করি, এমন কি, আমাদের নিজেদের জন্য যে কাজ করি, তাহার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

স্বার্থের জন্য কর্ম্ম দাসসুলভ কর্ম্ম। আর, কোন কর্ম্ম স্বার্থের জন্য কিনা তাহার এই পরীক্ষা যে, প্রেমের সহিত যে কোন কার্য্য হয় তাহাতেই সুখ আসিয়া থাকে। প্রকৃত প্রেম-প্রণোদিত এমন কোন কার্য্য নাই, যাহার ফলস্বরূপ শান্তি ও আনন্দ না আসিবে। প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্য পরস্পর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; আর প্রকৃতপক্ষে ইহারা একে তিন। যেখানে উহাদের মধ্যে একটি বর্ত্তমান, সেখানে অপরগুলিও অবশ্যই থাকিবে। উহারা সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ। যখন সেই সত্তা সান্ত ও আপেক্ষিকভাবাপন্ন হয়, তখন উহাকে আমরা জগৎস্বরূপে দেখিয়া থাকি। সেই জ্ঞানই আবার জাগতিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানে পরিণত হয় এবং সেই আনন্দ মানবহৃদয়ে যত প্রকার

প্রকৃত প্রেম আছে তাহার ভিত্তিস্বরূপ হয়। অতএব প্রকৃত প্রেম প্রেমিকা অথবা প্রেমাস্পদ কাহারও কষ্টের কারণ হইতে পারে না।

মনে কর, কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে। সে নিজেই তাহাকে একা দখল করিতে চায়, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে লইয়া তাহার ঈর্ষার উদয় হয়। তাহার ইচ্ছা—সে তাহার নিকট বসুক, তাহার নিকট দাঁড়াক এবং তাহার ইঙ্গিতে খাওয়া-দাপয়া, চলা-ফেরা প্রভৃতি সব কাজ করুক। সে ঐ স্ত্রীলোকটির ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাকেও আপনার ক্রীতদাসী করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিতেছে; উহা ভালবাসা নয়, উহা ক্রীতদাসের এক প্রকার ভাববিকার মাত্র—উহা যেন ভালবাসার মত দেখাইতেছে, বস্তুতঃ ভালবাসা নহে। উহা ভালবাসা নহে, কারণ উহাতে যন্ত্রণা আছে। যদি সে তাহার ইচ্ছা সম্পাদন না করে, তাহার যন্ত্রণা আসিবে। ভালবাসার কোন যাতনাকর প্রতিক্রিয়া নাই। ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কেবল আনন্দই আসিয়া থাকে। যদি তা না হয়, তবে সে ভালবাসা নয়, আমরা অপর কিছুকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করিতেছি। যখন তুমি তোমার স্বামী, স্ত্রী, ছেলে-পিলে, এমন কি, সমুদয় জগৎকে এমনভাবে ভালবাসিতে সমর্থ হইবে যে, তাহাতে কোনরূপ যন্ত্রণা, ঈর্ষা বা স্বার্থপরতারূপ প্রতিক্রিয়ার উদয় হইবে না, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "দেখ অর্জ্জুন, আমি যদি এক মুহূর্ত্ত কর্ম্ম হইতে বিরত হই, সমুদয় জগৎ নষ্ট হইবে; কিন্তু আমার জগৎ হইতে লাভের কিছুই নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু। কর্ম্ম করিয়া আমার কোন লাভ নাই। তবে আমি কর্ম্ম করি কেন?—জগৎকে ভালবাসি বলিয়া।" ঈশ্বর ভালবাসেন বলিয়াই তিনি অনাসক্ত। এই প্রকৃত ভালবাসা আমাদিগকেও অনাসক্ত করিয়া ফেলে। যেখানেই দেখিবে আসক্তি—পরস্পর এই ভয়ানক আকর্ষণ—সেখানেই জানিবে উহা শারীরিক আকর্ষণ—কতকগুলি জড়বিন্দুর সহিত আর কতকগুলি জড়বিন্দুর ভৌতিক আকর্ষণ—কিছু যেন দুইটি বস্তুকে ক্রমাগত নিকটবর্ত্তী করিতেছে; আর উহারা পরস্পর খুব নিকটবর্ত্তী না হইতে পারিলেই যন্ত্রণার উদ্ভব। কিন্তু যেখানে প্রকৃত ভালবাসা, সেখানে ভৌতিক আকর্ষণ কিছুমাত্র নাই। প্রকৃত ব্যক্তিগণ পরস্পর সহস্র মাইল ব্যবধানে থাকিতে পারেন, তাহাতে ভালবাসার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না এবং কোনরূপ যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়াও হইবে না।

এই অনাসক্তি লাভ করা একরূপ সারা জীবনের কার্য্য বলিলেও হয়। কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইলাম ও মুক্ত হইলাম। তখন প্রকৃতির বন্ধন আমাদের নিকট হইতে খসিয়া পড়ে, আমরা প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতি আমাদের পায়ে আর শিকল পরাইতে পারে না। আমরা তখন সম্পূর্ণ

স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি ও কর্ম্মের ফলাফলের দিকে লক্ষ্যশূন্য হই। ভাল মন্দ কি ফল হইল, তখন কে গ্রাহ্য করে? যে স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করে, সে ফলাকাঙ্ক্ষা করে না।

ছেলেদের কিছু দিলে তোমরা কি ছেলেদের নিকট হইতে তাহার কিছু প্রতিদান চাও? তাহাদের জন্য কাজ করা তোমার কর্ত্তব্য—ঐখানেই উহা শেষ হইল। কোন বিশেষ ব্যক্তি, নগর বা রাজ্যের জন্য যাহা করিতে ইচ্ছা কর করিয়া যাও, কিন্তু ছেলের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতি সেই ভাব ধারণ কর, উহাদের নিকট হইতে কিছু আশা করিও না। যদি তুমি সর্ব্বদাই এই ভাব অবলম্বন করিতে পার যে তুমি দাতামাত্র, তুমি যাহা দিতেছ তুমি তাহা হইতে প্রত্যুপকারের কোন আশা রাখ না, তবে সেই কর্ম্মে তোমার কোন আসক্তি আসিবে না। যখন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, তখনই আসক্তি আসে।

যদি দাসবৎ কার্য্য করিলে তাহাতে স্বার্থপরতা ও ফলাসক্তি আসে, তাহা হইলে নিজ মনের প্রভুবৎ কার্য্য করিলে তাহাতে অনাসক্তিজনিত আনন্দ আসিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদাই অধিকার ও ন্যায়ের কথা কহিয়া থাকি, কিন্তু দেখিতে পাই, উহারা কেবল শিশুসুলভ বাক্যমাত্র। কেবল দুইটি জিনিস আছে, যাহা মানবের চরিত্র-নিয়মনে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী হইয়া থাকে—জোরজুলুম ও দয়া। জোরজুলুম করা চিরকালই স্বার্থপরতা-বৃত্তির পরিচালনা। সকল নরনারীই তাহাদের যতটা

শক্তি ও সুবিধা আছে তাহার যতদূর পারে সহায়তা লইতে চাহে। দয়া স্বর্গতুল্য। ভাল হইতে গেলে আমাদের সকলকে দয়াবান হইতে হইবে। এমন কি, ন্যায় অধিকার শক্তি—এ সকলই দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। কার্য করিয়া তাহার প্রতিদান-লাভের চিন্তাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। শুধু তাহাই নহে, পরিণামে উহা অনেক কষ্ট লইয়া আসে। কেবল যে কার্য সমগ্র মানবসমাজ ও প্রকৃতির জন্য স্বাধীনভাবে করা হয়, তাহা কোনরূপ বন্ধন আনয়ন করে না। আর এক উপায় আছে, যাহাতে এই দয়া ও নিঃস্বার্থপরতাকে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে; অর্থাৎ যদি আমরা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে কার্য্যকে উপাসনা বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। আমরা এক্ষেত্রে আমাদের সমুদয় কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া থাকি। এইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিলে আমাদের কার্য্যের জন্য মানবজাতির নিকট কিছু আশা করিবার আমাদের অধিকার নাই। প্রভু স্বয়ং সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার কখনই কোনরূপ আসক্তি নাই। যেমন জল পদ্ম-পত্রকে ভিজাইতে পারে না, সেইরূপ কার্য্য ফলাসক্তি উৎপন্ন করিয়া নিঃস্বার্থপর ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। 'অহং'-শূন্য ও অনাসক্ত ব্যক্তি জনপূর্ণ ও পাপসঙ্কুল সহরের অভ্যন্তরে যাইতে পারেন, তিনি তাহাতে পাপে লিপ্ত হইবেন না।

এই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের ভাবটি নিম্নলিখিত গল্পটিতে স্ফুটীকৃত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে পঞ্চপাণ্ডবে

মিলিয়া একটি মহাযজ্ঞ করিলেন। তাহাতে দরিদ্রদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য বস্তু দান করা হইল। সকল ব্যক্তিই ঐ যজ্ঞের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্যে চমৎকৃত হইল আর বলিতে লাগিল—জগতে পূর্ব্বে এরূপ যজ্ঞ আর হয় নাই। যজ্ঞশেষে এক ক্ষুদ্রকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অর্দ্ধশরীর হিরণ্ময়, অর্দ্ধেক পিঙ্গলবর্ণ। সে সেই যজ্ঞভূমির মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তারপর সে চতুর্দ্দিকস্থ জনগণকে বলিল, "তোমরা সকলেই মিথ্যাবাদী, ইহা যজ্ঞই নহে।" তাহারা বলিতে লাগিল, "কি! তুমি বলিতেছ ইহা যজ্ঞই নহে? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে গরীবদিগকে কত ধনরত্নাদি প্রদত্ত হইয়াছে—সকলেই ধনবান ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া গিয়াছে? মানুষে ইহার মত অদ্ভুত যজ্ঞ আর করে নাই।" নকুল বলিল, "শুনুন—একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, তথায় এক গরীব ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ খুব গরীব ছিলেন; শাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা লব্ধ ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা ছিল।

"সেই দেশে এক সময় তিন বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষ আসিল; গরীব ব্রাহ্মণটি পূর্ব্বের চেয়ে অধিক কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেই পরিবারকে পাঁচ দিন ধরিয়া উপবাস করিতে হইল। ষষ্ঠ দিনে পিতা সৌভাগ্যক্রমে কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহা চারি ভাগ করিলেন। তাঁহারা উহা খাইবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়া ভোজনে বসিবেন,

এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল। পিতা দ্বার খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন এক অতিথি দাঁড়াইয়া। ভারতবর্ষে অতিথি বড় পবিত্র ও মান্য। সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে 'নারায়ণ' মনে করা হয় এবং তাঁহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা হয়। গরীব ব্রাহ্মণটি বলিলেন, 'আসুন, মহাশয়! আসুন, স্বাগত, স্বাগত।' ব্রাহ্মণ অতিথির সম্মুখে নিজ ভাগের খাদ্য রাখিলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই উহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমাকে একেবারে মারিয়া ফেলিলেন দেখিতেছি। আমি দশ দিন ধরিয়া উপবাস করিতেছি—এই অল্প পরিমাণ খাদ্যে আমার জঠরাগ্নি আরও জ্বলিয়া উঠিল!' তখন স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, 'উঁহাকে আমার ভাগও দিন।' স্বামী বলিলেন, 'না, তাহা হবে না।' কিন্তু স্ত্রী জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এ গরীব বেচারা আমাদের নিকট উপস্থিত, আমরা গৃহস্থ—আমাদের কর্ত্তব্য উঁহাকে খাওয়ান, আর যখন আপনার কিছু দিবার নাই তখন আমার উঁহাকে আমার ভাগ দেওয়া উচিত। তবেই আমার স্ত্রীর কর্ম্ম করা হইবে।' এই বলিয়া স্ত্রীও নিজ ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ তাহা নিঃশেষ করিলেন আর বলিলেন, 'আমি এখনও ক্ষুধায় জ্বলিতেছি।' তখন ছেলেটি বলিল, 'আপনি আমার ভাগও নিন। ছেলের কর্ত্তব্য—পিতাকে তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে সহায়তা করা।' অতিথি তাহাও খাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি অতৃপ্ত রহিলেন। তখন পুত্রবধূও তাঁহার ভাগ দিলেন। এইবার তাঁহার আহার পর্য্যাপ্ত হইল।

অতিথি তখন তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

"সেই রাত্রে ঐ চারিটি লোক অনাহারে মরিয়া গেলেন। ঐ ছাতুর গুঁড়া কিছু মেজেয় পড়িয়াছিল। উহার উপরে যখন আমি গড়াগড়ি দিলাম, তখন আমার অর্দ্ধেক শরীর সুবর্ণ হইয়া গেল; আপনারা সকলে ত ইহা দেখিতেছেন। সেই অবধি আমি সমুদয় জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, ইচ্ছা যে এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু আর সেরূপ যজ্ঞ দেখিতে পাইলাম না। আর কোথাও আমার শরীরের অপরার্দ্ধ সুবর্ণরূপে পরিণত হইল না। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, ইহা যজ্ঞই নহে।"

ভারত হইতে এইরূপ উচ্চ স্বার্থত্যাগ ও দয়ার ভাব চলিয়া যাইতেছে, মহাশয় ব্যক্তিদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে! নূতন ইংরেজী শিখিবার সময় আমি একখানি গল্পের বই পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে প্রথম গল্পটির মর্ম্ম এই: কোন বালক কাজ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহার কতকাংশ তাহার বৃদ্ধা জননীকে দিয়াছিল। বই-এর তিন-চার পৃষ্ঠা ধরিয়া বালকের এই কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণত্ব কি আছে? কোন হিন্দু বালকই এই গল্পের অভ্যন্তরে যে কি নীতিশিক্ষা আছে, তাহা ধারণা করিতে পারে না। এখন পাশ্চাত্য দেশের ভাব 'চাচা আপন বাঁচা' শুনিয়া আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি। এদেশে এমন লোক অনেক

আছে, যাহারা আপনারাই সমুদয় ভোগ করিতে থাকে, বাপ মা স্ত্রী-পুত্রদিগকে একেবারেই ভাসাইয়া দেয়। গৃহস্থের কুত্রাপি ও কদাপি এরূপ আদর্শ হওয়া উচিত নহে।

এখন তোমরা বুঝিতেছ, কর্ম্ম-যোগের অর্থ কি। উহার অর্থ—সম্মুখে মৃত্যু আসিলেও মুখটি বুঝিয়া সকলকে সাহায্য করা। লক্ষ লক্ষ বার লোকে তোমাকে প্রতারণা করুক কিন্তু তুমি একটি কথাও কহিও না, আর তুমি যে কিছু ভাল কাজ করিতেছ এ বিষয়ও ভাবিও না। দরিদ্রগণকে তুমি যে দান করিতেছ তাহার জন্য বাহাদুরি করিও না, অথবা তাহাদের কৃতজ্ঞতার আশাও রাখিও না; বরং তাহারা যে তোমায় তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া কঠিন। ত্যাগী ও কর্ম্মী উভয়েই ঠিক পথে যাইতেছেন এবং ত্যাগীর কঠোর জীবন হইতে কর্ম্মীর জীবন কঠোরতর না হইলেও অন্ততঃ তাঁহার মতই কঠোর বটে।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ত্তব্য কি ?

কর্ম্ম-যোগের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে কার্য্য কাহাকে বলে তাহা জানা আমাদের আবশ্যক। ইহা হইতেই স্বাভাবিক এই প্রশ্ন আসে যে, কর্ত্তব্য কি ? আমার যদি কিছু করিতে হয় তবে প্রথমে আমাকে আমার কর্ত্তব্য কি জানিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে তাহা করিবার শক্তি আমার আছে কি না। কর্ত্তব্যজ্ঞান আবার বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন। মুসলমান বলেন, তাঁহার শাস্ত্র কোরানে যাহা লিখিত আছে তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। হিন্দু বলেন, তাঁহার বেদে যাহা আছে তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। খ্রীষ্টিয়ান আবার বলেন, তাঁহার বাইবেলে যাহা আছে তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য। সুতরাং আমরা দেখিলাম, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন জাতির ভিতরে কর্ত্তব্যের ভাব অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে। অন্যান্য সার্ব্বভৌম-ভাব-বোধক শব্দের ন্যায় কর্ত্তব্য শব্দেরও লক্ষণ করা কঠিন। আমরা ইহার আনুষঙ্গিক সমুদয় ব্যাপার, কর্ম্মজীবনে উহার পরিণতি ও ফলাফল জানিয়াই উহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি।

যখন আমাদের সম্মুখে কতকগুলি ঘটনা ঘটে, তখন আমাদের সকলেরই সেইগুলি সম্বন্ধে কোন বিশেষভাবে কার্য্য

করিবার জন্য স্বাভাবিক অথবা পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবের উদয় হইলে মন সেই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। কখনও মনে হয় এরূপ অবস্থায় এইরূপ ভাবে কার্য্য করাই সঙ্গত, আবার অন্য সময়ে ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইলেও তদ্রূপভাবে কার্য্য করা অন্যায় বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্যের এই সাধারণ ধারণা দেখা যায় যে, সকল সৎ ব্যক্তিই নিজ বিবেকের (conscience) আদেশানুয়ায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যবিশেষ কি হইলে কর্ত্তব্যলক্ষণাক্রান্ত হয়? প্রাণসংশয়স্থলে যদি খ্রীষ্টিয়ান সম্মুখে গোমাংস পাইয়া নিজের প্রাণরক্ষার্থ উহা আহার না করে বা অপরের প্রাণরক্ষার্থ তাহাকে না দেয়, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্যের অবহেলা হইল নিশ্চিত বোধ করিবে। কিন্তু হিন্দু আবার যদি ঐরূপ স্থলে উহা ভোজন করে বা অপর হিন্দুকে উহা ভোজনার্থ প্রদান করে, সেও তদ্রূপ নিশ্চিত বোধ করিবে যে, তাহার কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন হইল। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কার তাহার হৃদয়ে তদ্রূপ ভাব আনিয়া দিবে। বিগত শতাব্দীতে ভারতে ঠগ নামে বিখ্যাত দস্যুদল ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল—যাহাকে পাইবে তাহাকেই মারিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাই তাহাদের কর্ত্তব্য; আর যত বেশী লোককে মারিতে পারিত, ততই তাহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিত। সাধারণতঃ একজন আর একজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলে সে মনে করে—সে

কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে, অন্যায় কার্য্য করিয়াছে এবং তজ্জন্য সে দুঃখিতও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই আবার যদি সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শুধু এক জনকে নয়, বিশ জনকে গুলি করিয়া হত্যা করে, তবে সে আনন্দিতই হইয়া থাকে এবং ভাবে সে তাহার কর্ত্তব্য অতি সুন্দরভাবে সাধন করিয়াছে। অতএব এটি বেশ সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কেবল কার্য্যটির বিচার করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয় না।

সুতরাং বাহিরের কার্য্য হিসাবে কর্ত্তব্যের একটি লক্ষণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; এটি কর্ত্তব্য, এটি অকর্ত্তব্য—এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে ভিতরের দিক হইতে কর্ত্তব্যের লক্ষণ করা যাইতে পারে বটে। যে কোন কার্য্য ভগবানের দিকে লইয়া যায় তাহাই সৎ কার্য্য আর যে কোন কার্য্য আমাদিগকে নিম্নদিকে লইয়া যায় তাহা অসৎ কার্য্য। ভিতরের দিক হইতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি কার্য্য আমাদিগকে উন্নতিপ্রবণ করে, আর কতকগুলি কার্য্যের প্রভাবে আমরা অবনত ও পশুভাবাপন্ন হইয়া যাই। কিন্তু সর্ব্ববিধ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কার্য্যের দ্বারা কিরূপ ভাব আসিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কেবল একটি ধারণা সকল যুগের, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের নরনারী একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, আর উহা এই নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধে বর্ণিত হইয়াছে—"পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।"

ভগবদ্গীতা জন্ম ও অবস্থাগত কর্ত্তব্যের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যেরূপ সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতেই অনেক পরিমাণে জীবনের বিভিন্ন কর্ত্তব্যগুলি আমরা কি ভাবে দেখিব, তাহা স্থির হইয়া থাকে। এই কারণে আমাদের সামাজিক অবস্থা-সঙ্গত অথচ হৃদয় ও মনের উন্নতিবিধায়ক কার্য্য আমাদের করা উচিত। কিন্তু এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার আদর্শ ও এক প্রকার কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত নহে। আমাদের এতদ্বিষয়ক অজ্ঞতাই এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঘৃণার প্রধান কারণ। মার্কিনেরা ভাবেন, তাঁহাদের দেশের প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; সুতাং যে ব্যক্তি সেই প্রথার অনুসরণ না করে, সে অতি বদ্ লোক; হিন্দু ভাবেন, তাঁহার আচার-ব্যবহারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সত্য; সুতরাং যে কেহ উহার অনুসরণ না করে সে অতি মন্দ লোক। আমরা অতি সহজেই এই ভ্রমে পড়িয়া থাকি এবং ইহা খুব স্বাভাবিকও বটে। তবে এই ভ্রমটি বড়ই অনিষ্টকর; আর সংসারে যে পরস্পর সহানুভূতির অভাব ও পরস্পর ঘৃণা দেখা যায়, তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী এই ভ্রম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি যখন প্রথম এদেশে আসি, তখন একদিন চিকাগো মেলার মধ্যে বেড়াইতেছিলাম— একজন লোক আমার পিছনে আসিয়া আমার পাগড়ি ধরিয়া জোরে এক টান মারিলেন। আমি পিছু ফিরিয়া দেখি,

লোকটির বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়, তাহাকে বেশ ভদ্রলোকের মত দেখিতে। আমি তাঁহার সহিত ইংরেজীতে কথা বলিলাম—ইংরেজী বলিবামাত্র লোকটি খুব লজ্জিত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি ইংরেজী বলিতে পারি না। আর একবার ঐ মেলাতেই আর একজন লোক আমাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও অপ্রতিভ হইলেন, শেষে আম্‌তা আম্‌তা করিতে করিতে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনি অমন করিয়া পোষাক করিয়াছেন কেন?" এই ব্যক্তি—যিনি আমাকে আমি তাঁহার মত পোষাক করি না কেন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমার ঐ বেশের দরুন আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ খুব ভাল লোক; তিনি হয়ত সন্তানবৎসল পিতা এবং একজন শিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি; কিন্তু যখনই তিনি একটা লোককে ভিন্নবেশপরিহিত দেখিলেন, তখনই তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ সহৃদয়তা নষ্ট হইয়া গেল। সকল দেশেই বৈদেশিকদিগকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়; কারণ তাহারা সাধারণতঃ নূতন অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা জানে না। এই জন্য তাহারা সেই দেশের লোকের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা লইয়া যায়। নাবিক, সৈন্য ও বণিকগণ বিদেশে এমন অদ্ভুত ব্যবহার করিয়া থাকে, যাহা তাহারা নিজেদের দেশে থাকিতে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। এই

কারণেই বোধ হয় চীনারা ইউরোপীয় ও মার্কিনগণকে 'বিদেশী ভূত' বলিয়া থাকে।

সুতরাং একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমরা যেন অপরের কর্ত্তব্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদেরই চোখ দিয়া দেখি, যেন অপর জাতির আচার-ব্যবহার আমাদের নিজেদের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে না যাই। ইহাই আমাদের বিশেষ শিক্ষার বিষয় যে, আমার ধারণা অনুসারে সমুদয় জগৎ পরিচালিত হইতে পারে না; আমাকেই সমুদয় জগতের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে হইবে, সমুদয় জগৎ কখন আমার ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে না। অতএব দেখিতেছি, বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কত বদলাইয়া যায়; আর কোন বিশেষ সময়ে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাল করিয়া করা জগতে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। প্রথম আমাদের জন্মপ্রাপ্ত কর্ত্তব্য করা আবশ্যক, তারপর আমাদের 'পদের' যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনে কোন না কোন অবস্থায় অবস্থিত; তাহার প্রথমে সেই অবস্থাসঙ্গত কর্ত্তব্য করা আবশ্যক। মনুষ্যস্বভাবে একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা এই যে, মানুষ কখনই নিজের প্রতি দৃষ্টি করে না। সে ভাবে, রাজার ন্যায় সেও সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। যদিও সে উপযুক্ত হয়, তথাপি তাহাকে দেখান উচিত যে, সে অগ্রে নিজ অবস্থাসঙ্গত কার্য্য উত্তমরূপে করিয়াছে। তাহা

সম্পন্ন করিলে পরে তাহার নিকট উচ্চতর কর্ত্তব্য আসিবে। সে জগৎকে দেখাক যে, যে ক্ষুদ্র কার্যভার তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে তাহা উত্তমরূপে পালন করিতে সে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাহা করিতে পারিলেই তাহার নিকট অপর উচ্চতর কার্য্য আসিবে। জগতে উঠিয়া পড়িয়া কাজে লাগিবামাত্র প্রকৃতিই আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়া আমরা বাস্তবিক কোন্ পদে থাকিবার অধিকারী, তাহা শীঘ্র বুঝিতে সমর্থ করে। যে যে কার্য্যের উপযুক্ত নহে, সে দীর্ঘকাল সেই পদে থাকিয়া সকলের সন্তোষবিধান করিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি যাহার সম্বন্ধে যেরূপ বিধান করে, তাহার বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই এবং কাহাকেও ছোট কাজ করিতে হইতেছে বলিয়াই তাহাকে সামান্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। কাহারও কর্ত্তব্যের প্রকৃতি দেখিয়া তাহাকে বিচার করা উচিত নহে—যে ভাবে সে সেই কার্য্য করিয়া থাকে, তদ্দ্বারাই তাহাকে বিচার করিতে হইবে।

পরে দেখিব, এই কর্ত্তব্যের ধারণা পর্য্যন্ত আমাদিগকে উল্‌টাইয়া ফেলিতে হইবে; আর তখনই মানুষ খুব শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম করিতে পারে, যখন পশ্চাতে বাসনার উত্তেজনা প্রায় থাকে না। তাহা হইলেও এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানে কার্য্যই আমাদিগকে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অতীত কার্য্যে লইয়া যায়। তখন কার্য্য উপাসনারূপে পরিণত হয়—শুধু তাহাই নহে, কার্য্য কেবল

কার্য্যের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে ইহা আদর্শমাত্র, উহার পথ এই 'কর্ত্তব্য'। আমরা পরে দেখিব, কর্ত্তব্য কর্ম্ম নীতি বা প্রেমরূপ যে সকল ভিত্তির উপর স্থাপিত তৎসমুদয়ের রহস্য এই যে, 'কাঁচা আমি'কে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম করা যাহাতে 'পাকা আমি' নিজ মহিমায় শোভা পাইতে পারেন, নিম্নস্তরের শক্তিক্ষয়-নিবারণ যাহাতে আত্মা উচ্চ উচ্চ ভূমিতে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন। নীচ বাসনার উদয় হইলেও যদি উহাদিগকে চরিতার্থ না করা যায়, তাহা হইলে আত্মার মহিমার প্রকাশ হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গেলেও অনিবার্য্যরূপে এই স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমুদয় সমাজ-সংহতি উৎপন্ন হইয়াছে; উহা যেন কার্য্যক্ষেত্র—সদসৎ পরীক্ষা-ভূমি। এই কার্য্যক্ষেত্রে স্বার্থপূর্ণ বাসনা কমাইতে কমাইতে আমরা মানবের প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়া দিই। ভিতরের দিক হইতে দেখিলে কর্ত্তব্যের এই একটি সুনিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যায় যে, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হইতে পাপ ও অসাধুতার উদ্ভব; আবার নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মসংযম হইতে ধর্ম্মের বিকাশ।

কর্ত্তব্য কিন্তু খুব কম সময়েই মিষ্ট লাগে। কেবল প্রেম কর্ত্তব্য-চক্রকে স্নেহাক্ত করিলেই উহা বেশ মসৃণ ভাবে চলিতে আরম্ভ হয়, নতুবা ক্রমাগত ঘর্ষণ! কোন্ পিতামাতা সন্তানের প্রতি ঠিক কর্ত্তব্য করিতে পারেন?

কোন্ সন্তানই বা পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য করিতে পারেন ? কোন্ স্বামী স্ত্রীর প্রতি, আর কোন্ স্ত্রীই বা স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন ? আমরা আমাদের জীবনে প্রতিদিনই কি ক্রমাগত সংঘর্ষ দেখিতেছি না ? প্রেমমাখা হইলেই কর্ত্তব্য মিষ্ট হয়। প্রেম আবার কেবলমাত্র স্বাধীনতাতেই দীপ্তি পায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষার দাস এবং শত শত ছোট ছোট ঘটনা যাহা সংসারে প্রত্যহ ঘটিয়া থাকে তাহার দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা ? আমরা জীবনে যত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্কশ ভাব প্রত্যক্ষ করি, ঐ গুলিতে সহিষ্ণুতা-অবলম্বনই স্বাধীনতার সর্ব্বোচ্চ অভিব্যক্তি। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সহজে-উত্তেজিত, ঈর্ষাপূর্ণ মেজাজের দাস হইয়া তাহাদের স্বামীর প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে এবং মনে করিয়া থাকে—আমরা স্বাধীন, কিন্তু জানে না যে,তাহারা এইরূপে আপনাদিগকে প্রতি পদে দাস বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতেছে। যে সকল স্বামী সর্ব্বদাই তাহাদের স্ত্রীর দোষ দেখিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

ব্রহ্মচর্য্যই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রথম ধর্ম্ম ; আর এমন মানুষ পাওয়া দুর্ঘট যাহাকে (সে যতদূর মন্দ হইয়াই যাউক না কেন) নম্রা প্রেমিকা সতী স্ত্রী ফিরাইয়া সৎপথে না আনিতে পারে। জগৎ এখনও এতদূর মন্দ হয় নাই। সমুদয় জগতে আমি নৃশংস পতি ও পুরুষের অপবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে,

নৃশংসা ও অপবিত্রা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও পুরুষের সংখ্যার অনুরূপ।

যদি মার্কিন মহিলাগণ নিজেরা যতদূর বড়াই করেন ততদূর পবিত্র ও সৎ হইতেন (বিদেশী লোকে তাহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে খুব পবিত্র ও সৎ বলিয়াই বিশ্বাস করে) তবে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এদেশে একটীও অপবিত্র পুরুষ থাকিত না। মানুষ কাহাকে লইয়া অপবিত্র হইবে! এমন পাশব ভাব কি আছে যাহা পবিত্রতা ও সতীত্ব জয় করিতে না পারে? একজন কল্যাণী সতী স্ত্রী—যিনি নিজ স্বামী ব্যতীত সকলকেই তাঁহার ছেলের মত দেখেন, আর সকল লোকের প্রতিই জননীভাব পোষণ করেন, তিনি পবিত্রতা-শক্তিতে এতদূর উন্নতা হন যে, এমন পশুপ্রকৃতি লোক নাই সে তাঁহার সমক্ষে পবিত্রতার হাওয়া না অনুভব করিবে। প্রত্যেক স্বামীও তদ্রূপ নিজ পত্নী ব্যতীত অপরাপর স্ত্রীলোককে মাতা, কন্যা বা ভগিনীরূপে দেখিবেন। যে ব্যক্তি আবার ধর্ম্মাচার্য্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার প্রত্যেক স্ত্রীলোকের উপর মাতৃভাব অবলম্বন করা এবং তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা তদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত্।

মাতৃপদই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ, কারণ উহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিঃস্বার্থপরতা-শিক্ষা ও নিঃস্বার্থপর কার্য্য করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবৎ-প্রেমই কেবল মায়ের ভালবাসা হইতে উচ্চতর, আর সবই নিম্নশ্রেণীর।

মাতার কর্ত্তব্য প্রথমে ছেলেদের বিষয় ভাবা, তারপর নিজের বিষয়। তাহা না করিয়া যদি বাপ মা সর্ব্বদা সামান্য খাবার-দাবার বিষয়ে পর্য্যন্ত প্রথমে নিজেদের বিষয় ভাবেন—নিজেই ভাল অংশটুকু লন, ছেলেরা পাইল কি না পাইল সে দিকে দৃষ্টি না করেন, তবে ফল এই হয় যে, বাপ মা ও ছেলেদের ভিতর সম্বন্ধ দাঁড়ায় পাখী আর পাখীর ছানার সম্বন্ধের মত। পাখীর ছানাদের ডানা উঠিলে তাহারা আর বাপ মা মানে না। সেই লোকই বাস্তবিক ধন্য, যে স্ত্রীলোককে ভগবানের মাতৃভাবের প্রেমমূর্ত্তি বলিয়া দেখিতে সমর্থ। সেই স্ত্রীলোকও ধন্য, যিনি মানুষকে ভগবানের পিতৃভাবের প্রতিমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পারেন। সেই সন্তানেরাও ধন্য যাহারা তাহাদের পিতামাতাকে ভগবানের প্রকাশরূপে দেখিতে সমর্থ হয়।

উন্নতিলাভের একমাত্র উপায় এই: আমাদের হস্তে যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহারই অনুষ্ঠানে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ক্রমশঃ উচ্চপথে যাওয়া, যতদিন না আমরা সেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। কোন কর্ত্তব্যকে আবার ঘৃণা করিলে চলিবে না। আমি আবার বলিতেছি, যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্ন কার্য্য করে, সে উচ্চতর কার্য্যকারী অপেক্ষা নিম্নদরের লোক হইয়া যায় না। মানুষের কর্ত্তব্যের প্রকার দেখিয়া তাহাকে বিচার করিলে চলিবে না, তাহার সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার

প্রকার দেখিতে হইবে। তাহার ঐ কার্য্য করিবার প্রকার এবং করিবার শক্তিই সেই ব্যক্তির পরীক্ষার উপায়। প্রত্যহ আবোল-তাবোল বকিয়া থাকে এমন একজন অধ্যাপক অপেক্ষা একজন মুচি (তাহার নিজ ব্যবসায় ও কার্য্য হিসাবে) শ্রেষ্ঠ, যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পক্ষণের মধ্যে একজোড়া শক্ত সুন্দর জুতা প্রস্তুত করিতে পারে।

কোন যুবা সন্ন্যাসী এক বনে গমন করিয়া অনেক দিন ধরিয়া ধ্যান-ভজন ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনার পর একদিন তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তকে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িল। তিনি উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক কাক ও বক গাছের উপর বসিয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি বলিলেন, 'কি! তোরা আমার মাথায় শুষ্ক পত্র ফেলিতে সাহস করিলি?' এই বলিয়া তাহাদের দিকে যেমন ক্রোধে কটমট করিয়া চাহিলেন, অমনি তাঁহার মস্তক হইতে যোগাগ্নি নির্গত হইয়া পক্ষীগুলিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। তখন তাঁহার বড় আনন্দ হইল, আপনার এইরূপ শক্তির বিকাশে তিনি আনন্দে একরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; ভাবিলেন, 'বাঃ, আমি এক কটাক্ষপাতে কাক-বককে ভস্মসাৎ করিতে পারি!' কিছুদিন পরে তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে নগরে যাইতে হইল। তিনি একটি দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "মা, আমাকে কিছু খাইতে দিন।" ভিতর

হইতে আওয়াজ আসিল—"বৎস, একটু অপেক্ষা কর।" যোগী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পাপিষ্ঠা, তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! তুই আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিস? এখনও তুই আমার শক্তি জানিস না?" তিনি মনে মনে এইরূপ বলিতেছিলেন। আবার সেই আওয়াজ আসিল, "বৎস! নিজের এত অহঙ্কার করিও না, এ কাক-বক-ভস্ম নহে।" তিনি বিস্মিত হইলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অবশেষে এক স্ত্রীলোক আসিলেন। যোগী তাহার চরণে পড়িয়া বলিলেন, "মা, আপনি উহা কিরূপে জানিলেন?" তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি তোমার যোগ-যাগ কিছুই জানি না। আমি একজন সামান্যা স্ত্রী। আমি তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমার স্বামী পীড়িত, আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম, ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম। আমি সারা জীবন কর্ত্তব্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যখন অবিবাহিতা ছিলাম তখন কন্যার কর্ত্তব্য যাহা তাহা করিয়াছি। এক্ষণে বিবাহিতা হইয়াও আমার কর্ত্তব্য করিতেছি। ইহাই আমার যোগাভ্যাস। এই কর্ত্তব্য করিয়াই আমার দিব্যচক্ষু খুলিয়াছে; তাহাতেই আমি তোমার মনোভাব ও অরণ্যে তোমার কৃত সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে কিছু উচ্চতর তত্ত্ব জানিতে চাও ত অমুক নগরের বাজারে যাও, তথায় একটি ব্যাধকে দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে এমন উপদেশ দিবেন, যাহা শিক্ষা করিতে তোমার পরম

আনন্দ হইবে।” সন্ন্যাসী ভাবিলেন, ‘অমুক নগরে একটা ব্যাধের কাছে কেন যাইব?’

কিন্তু যে ব্যাপার এখানে দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি সেই নগরে যাত্রা করিলেন। নগরের নিকটে আসিয়া বাজার দেখিতে পাইলেন। দূরে দেখিলেন, একজন খুব স্থূলকায় ব্যাধ বসিয়া বৃহৎ ছুরিকা দ্বারা পশুবধ করিতেছে, আর নানা লোকের সহিত বচসা ও কেনা-বেচা করিতেছে। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, ‘রাম রাম! এই লোকের নিকট আমাকে শিখিতে হইবে! এ ত দেখিতেছি একটা পিশাচের অবতার!’ ইতোমধ্যে ঐ লোকটি উপরদিকে চাহিয়া বলিল, “স্বামিন্! অমুক মহিলাটি কি আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন? আমার কার্য্য সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই আসনে উপবেশন করুন।” সন্ন্যাসী ভাবিলেন, ‘এখানে আমার কি হইবে?’ যাহা হউক, তিনি একটি আসন লইয়া উপবেশন করিলেন। সেই ব্যাধ আপন কার্য্য করিতে লাগিল। কেনা-বেচা সাঙ্গ হইলে পর সে আপনার টাকাকড়ি সব লইয়া সন্ন্যাসীকে বলিল, “আসুন মহাশয়, আমার বাটীতে আসুন।” তখন তাঁহারা দুইজনে ব্যাধের গৃহে উপনীত হইলেন। ব্যাধ তাঁহাকে একটি আসন দিয়া বলিল, “মহাশয়, একটু অপেক্ষা করুন।” তারপর বাটীর ভিতরে গিয়া—সেখানে তাহার বাপ মা ছিলেন—তাঁহাদের হাত পা ধোয়াইয়া দিল, তাঁহাদিগকে

খাওয়াইল, আর সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাদের সন্তোষবিধান করিল তারপর তাঁহার নিকট আসিয়া একটি আসনে উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনি আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, বলুন আমি আপনার কি করিতে পারি?" তখন সন্ন্যাসী তাঁহাকে আত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, তাহা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদান্ত—দর্শনের চরম সীমা। তোমরা ভগবদ্গীতার নাম শুনিয়াছ, উহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করিয়া তোমাদের এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। ইহা বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব। ব্যাধের উপদেশ শেষ হইলে সন্ন্যাসী অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, "আপনার এরূপ উচ্চ জ্ঞান, তথাপি আপনি এই ব্যাধদেহ অবলম্বন করিয়া এরূপ কুৎসিত কর্ম্ম করিতেছেন কেন?" তখন ব্যাধ উত্তর করিল, "বৎস, কোন কর্ম্মই অসৎ নহে, কোন কর্ম্মই অপবিত্র নহে। এই কার্য্য আমার জন্মগত, ইহা আমার প্রারব্ধ-লব্ধ। আমি বাল্যকালে এই ব্যবসায় শিক্ষা করি। আমি অনাসক্তভাবে আমার সমুদয় কর্ত্তব্য উত্তমরূপে করিবার চেষ্টা করি, আমি গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন ও পিতামাতাকে যথাসাধ্য সুখী করিবার চেষ্টা করি। আমি তোমার যোগও জানি না এবং সন্ন্যাসীও হই নাই। আমি কখনও সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাই নাই। নিজ অবস্থা-সঙ্গত কর্ত্তব্য করাতেই আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে।"

ভারতে একজন খুব উচ্চাবস্থাপন্ন যোগী আছেন *; আমি জীবনে যত অদ্ভুত লোক দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ইনি একজন। ইনি এক অদ্ভুত রকমের লোক; তিনি কখনও কাহাকেও উপদেশ দিবেন না; কোন প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার উত্তর দিবেন না। তিনি আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত—তিনি কখনও উহা গ্রহণ করিবেন না। তুমি তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুদিন অপেক্ষা কর, কথাবার্ত্তা-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই সে বিষয় উত্থাপন করিবেন এবং ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিবেন। তিনি আমায় এক সময়ে কর্ম্মরহস্য এইরূপ বলেন যে, 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' †—যখন তুমি কোন কার্য্য করিতেছ, তখন আর অন্য কিছু ভাবিও না; পূজাস্বরূপে—সর্ব্বোচ্চ পূজা-স্বরূপে উহার অনুষ্ঠান কর। সেই সময়ের জন্য সমুদয় মন প্রাণ অর্পণ করিয়া উহার অনুষ্ঠান কর। দেখ, উক্ত গল্পে ব্যাধ আর ঐ রমণী সন্তোষ, আগ্রহ ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য করিয়াছিল এবং তাহারই ফলস্বরূপ তাহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিল। সকল কর্ত্তব্যই পবিত্র, এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরোপাসনা। উহা যে বদ্ধ

---

* পওহারী বাবা—ইঁহার আশ্রম ছিল গাজিপুরে। ইনি এক্ষণে দেহরক্ষা করিয়াছেন। স্বামিজী-কৃত ইঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত আছে।

† যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি—অর্থাৎ সাধনকালে সাধনবিষয়েই মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিবে, উহারই চরম অবস্থার নাম সিদ্ধি।

জনগণের অজ্ঞানভারাক্রান্ত আত্মাকে উদ্ধার ও উহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই গল্পে স্পষ্টই দেখাইতেছে যে, যে কোন অবস্থারই কর্ত্তব্য হউক না কেন, ঠিক ঠিক রূপে অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা আমাদিগকে পরমপদ-প্রাপ্তি করাইয়া দেয়।

আমাদের কর্ত্তব্যসকল প্রধানতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাচক্র দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কর্ত্তব্যের ভিতর কিছু বড় ছোট থাকিতে পারে না। সকাম কর্ম্মীই তাহার অদৃষ্টে যে কর্ত্তব্য পড়িয়াছে তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে সকল কর্ত্তব্যই সমান এবং সকলগুলিই উপযুক্ত সহায়স্বরূপে তাহার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে সম্পূর্ণ-রূপে নাশ করিয়া দিয়া তাহাকে নিশ্চিত মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। আমরা যে, কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কারণ—আমরা সকলেই আপনাদের খুব বড় ভাবিয়া থাকি। কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা আমাদের নিম্ন-অবস্থানির্দ্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলিরও ঠিক ঠিক সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। যখন আমি বালক ছিলাম, তখন আমার অনেক রকম খেয়াল হইত—কখন ভাবিতাম, আমি একটা মস্তবড় সম্রাট; কখন বা আপনাকে অন্য কোনরূপ একটা বড়লোক ভাবিতাম। বোধ হয় তোমরাও

বাল্যকালে এরূপ অনেক খেয়াল দেখিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়াল মাত্র; প্রকৃতিই সর্ব্বদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্ম্মানুযায়ী ন্যায়ানুগত ফলবিধান করিয়া থাকে—তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার নহে। সেইজন্য আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্ম্মফল অনুসারেই আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে—যাহা আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে, তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তিলাভ করিয়া থাকি। এইরূপে ধীরে ধীরে বল বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায়ও পঁহুছিতে পারি, যে সময়ে আমরা সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় ও সম্মান-জনক কর্ত্তব্যসাধনের সৌভাগ্য লাভ করিব। এইটি জানিয়া রাখা ভাল, কারণ প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং উহা হৃদয়ের সমুদয় সৎ ও কোমল ভাবগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্ত্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুতেই তাহাকে কখন সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, আর সে তাহার সারা জীবনটা নিশ্চিতই কোন কার্য্যে সুফলকাম হইতে পারিবে না। সুতরাং এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে কোন কর্ত্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি —সর্ব্বদাই যেন কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবেই আমরা নিশ্চিত আলোক দেখিতে পাইব।

পঞ্চম অধ্যায়

পরোপকারে কাহার উপকার ?

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিরূপ সহায়তা হয়, তদ্বিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কর্ম্ম বলিতে ভারতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহার আর একটি দিক যত সংক্ষেপে সম্ভব তোমাদের নিকট বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই তিনটি করিয়া বিভাগ আছে। ১ম—দার্শনিক ভাগ, ২য়—পৌরাণিক ভাগ, ৩য়—আনুষ্ঠানিক ভাগ বা ক্রিয়াকর্ম্ম। অবশ্য দার্শনিক ভাগই সকল ধর্ম্মের সার-স্বরূপ। পৌরাণিক ভাগ ঐ দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র; উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী ও অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ঐ দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ঐ দর্শনেরই আরও অধিক স্থূলতর রূপ—যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে পারে। অনুষ্ঠান প্রকৃত-পক্ষে দর্শনেরই স্থূলতর ভাবমাত্র। এই অনুষ্ঠানই কর্ম্ম। প্রত্যেক ধর্ম্মেই ইহা প্রয়োজনীয়; কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই যত দিন না আধ্যাত্মিক বিষয়ে খুব উন্নতি লাভ করিতেছি, ততদিন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব ধারণায় অসমর্থ। লোকে সহজেই ভাবিয়া থাকে যে, তাহাদের পক্ষে সকল বিষয়ই বুঝা সহজ; কিন্তু হাতে-

কলমে করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ ঠিক ঠিক ধারণা ও হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। এই কারণে প্রতীকের দ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে, আর উহার সাহায্যে ঐরূপ বিষয়সকল ধারণার প্রণালী আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। স্মরণাতীত কাল হইতে সকল ধর্ম্মেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এক হিসাবে আমরা প্রতীক ব্যতীত চিন্তাই করিতে পারি না; শব্দসমূহ চিন্তার প্রতীকমাত্র। অন্য হিসাবে জগতের সমুদয় পদার্থকেই প্রতীক বলা যাইতে পারে। সমুদয় জগৎই প্রতীকস্বরূপ, আর ঈশ্বর মূলতত্ত্বরূপে উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন। এইরূপ প্রতীক কেবল মানবসৃষ্ট নহে। কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি ব্যক্তি যে একস্থানে বসিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি প্রতীকের সৃষ্টি করিলেন তাহা নহে, উহারা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা না হইলে কতকগুলি প্রতীক প্রায় সকল ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতকগুলি প্রতীক সার্ব্বজনীন দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকের ধারণা—খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ আসিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই, মুশা জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্ব হইতেই—এমন কি মানবজাতি কর্ত্তৃক মানবীয় কার্য্যকলাপের কোন প্রকার ইতিহাস রক্ষিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই উহা বর্ত্তমান ছিল। আজটেক ও ফিনিসিয় জাতির মধ্যে যে ক্রুশ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া

যায়। খুব সম্ভব যে, সকল জাতিই এই ক্রুশ ব্যবহার করিতেন। আবার ক্রুশবিদ্ধ পবিত্রতার—একটি লোক ক্রুশবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ মানুষের—প্রতীক প্রায় সকল জাতির মধ্যে ছিল বলিয়া বোধ হয়। বৃত্ত সমগ্র জগতের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট প্রতীকের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর সর্ব্বাপেক্ষা সার্ব্বজনীন প্রতীক স্বস্তিক 卐 রহিয়াছে। এক সময়ে লোকে ভাবিত, বৌদ্ধগণ সমুদয় জগতে উহা বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে জানিতে পারা গিয়াছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন জাতিতে উহা প্রচলিত ছিল! প্রাচীন বাবিলন ও ইজিপ্টেও ইহা পাওয়া যাইত। ইহাতে কি দেখাইতেছে ? ইহাই দেখাইতেছে যে, এই প্রতীকগুলি কেবল কতকগুলি ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত বা কল্পনাপ্রসূত নহে। উহাদের নিশ্চিত কোন যুক্তি আছে, উহাদের সহিত মনুষ্যমনের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ভাষাও এইরূপ একটা কৃত্রিম বস্তু নহে। কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া কতকগুলি ভাবকে বিশেষ বিশেষ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিবে —এইরূপ চুক্তি করাতে ভাষারও উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। কোন ভাবই তাহার আনুষঙ্গিক শব্দ ব্যতিরেকে, অথবা কোন শব্দই তাহার আনুষঙ্গিক ভাব ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না। শব্দ ও ভাব স্বভাবতঃই অবিচ্ছেদ্য। ভাবসমূহ বুঝাইবার জন্য শব্দ বা বর্ণপ্রতীক উভয়ই ব্যবহৃত হইতে পারে। বধির ও মূক ব্যক্তিগণের

শব্দপ্রতীকের দ্বারা কোনরূপ সাহায্য হয় না, তাহাদিগকে অন্য প্রতীকের সহায়তা লইতে হয়। মনের প্রত্যেক চিন্তাটির অপরাংশস্বরূপ একটি করিয়া আকৃতিবিশেষ আছে। সংস্কৃত দর্শনে উহাদিগকে 'নাম-রূপ' বলিয়া থাকে। যেমন কৃত্রিম উপায়ে ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব, তদ্রূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রতীক সৃষ্টি করাও অসম্ভব। জগতে অনুষ্ঠানের সহকারী যে সকল প্রতীক দেখা যায়, তাহারা মানবজাতির ধর্ম্মচিন্তার এক এক রূপ-প্রকাশ-বিশেষ মাত্র। অনুষ্ঠান, মন্দিরাদি ও অন্যান্য বাহ্য-আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নাই—একথা বলা খুব সহজ; আজকাল কচি ছেলেরাও এ কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু তোমরা ইহাও অতি সহজে দেখিতে পাইবে যে, যাহারা মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করে, তাহারা অনেক বিষয়ে যাহারা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করে না তাহাদের হইতে বিভিন্ন। এই কারণে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের সহিত যে বিশেষ বিশেষ মন্দির, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থূল ক্রিয়াকলাপ জড়িত আছে, তাহা তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বীর মনে—সেই সেই স্থূল বস্তুগুলি যাহাদের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত —তাহাদের চিন্তা উদ্রেক করিয়া দেয়। আর একেবারে অনুষ্ঠান ও প্রতীক উড়াইয়া দেওয়া সুবিধাজনক নহে। এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা ও অভ্যাসও স্বভাবতঃই কর্ম্ম-যোগের এক অংশস্বরূপ।

এই কর্ম্ম-যোগের আরও অন্যান্য দিক আছে। তাহাদের মধ্যে একটি এই—'ভাব' ও 'শব্দ'-এর মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে

এবং শব্দশক্তিতে কি হইতে পারে তাহা জানা। সকল ধর্ম্মে শব্দশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে ; এমন কি, কোন কোন ধর্ম্মে সৃষ্টিটাই 'শব্দ' হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বাহ্য ভাব—'শব্দ,' আর যেহেতু ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে সঙ্কল্প ও ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই হেতু সৃষ্টি 'শব্দ' হইতেই আসিয়াছে। এই জড়বাদময় জীবনের পেষণে ও ক্ষিপ্রতায় আমাদের স্নায়ুরও জড়তা উপস্থিত হইয়াছে। যতই আমরা বৃদ্ধ হইতে থাকি, যতই আমরা এই জগতে ঘা খাইতে থাকি, ততই আমাদের স্নায়ুর যেন জড়ত্ব উপস্থিত হয় ; আর যে সকল ঘটনা ক্রমাগত আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘটিতেছে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলিকেও আমরা অবহেলা করিতে প্রবৃত্ত হই। যাহা হউক, সময়ে সময়ে মানবের স্বাভাবিক ভাব প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে এবং আমরা এই সকল সাধারণ ঘটনার অনেকগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই ও উহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। আর এইরূপ বিস্ময়ই জ্ঞানালোকপ্রাপ্তির প্রথম সোপান। উচ্চ দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে শব্দতত্ত্বের মূল্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, শব্দপ্রতীক মানবজীবন-রঙ্গমঞ্চে এক প্রধান অংশ অভিনয় করিয়া থাকে। আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আমি তোমাকে স্পর্শ করিতেছি না। আমার কথা দ্বারা যে বায়ুর কম্পন হইতেছে, তাহা তোমার কর্ণে গিয়া তোমার স্নায়ুগুলিকে স্পর্শ করিতেছে এবং

তোমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে মূর্খ বলিল—অমনি সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার নাকে ঘুষি মারিল। দেখ—শব্দের কি শক্তি! জনৈকা মহিলা শোকাক্রান্ত হইয়া কাঁদিতেছেন; আর একজন মহিলা আসিয়া তাঁহাকে দুই-চারিটি মিষ্টকথা শুনাইলেন, অমনি সেই রোদনপরায়ণা রমণীর বক্রদেশ সোজা হইল, তাঁহার শোক চলিয়া গেল, তাঁহার মুখে হাস্য দেখা দিল। দেখ, শব্দের কি শক্তি! উচ্চ দর্শনে যেমন, সাধারণ জীবনেও তদ্রূপ শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই শক্তির সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান ও অনুসন্ধান না করিলেও দিবারাত্র এই শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছি। এই শক্তির স্বরূপ অবগত হওয়া ও উহার উত্তমরূপ পরিচালনাও কর্ম্ম-যোগের অংশ বিশেষ।

অপরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য অর্থে—অপরের সাহায্য করা, জগতের উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করিব? আপাততঃ বোধ হয় যে, আমরা জগতের উপকার করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেরাই উপকৃত হইয়া থাকি। আমাদের সর্ব্বদাই জগতের উপকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক, ইহাই যেন আমাদের কার্য্যপ্রবৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামক অভিসন্ধি হয়; কিন্তু যদি আমরা বিশেষ বিচার করিয়া দেখি, তবে দেখিব এই জগৎ আমাদের নিকট হইতে

কোন উপকার প্রার্থনা করে না। তুমি আমি জগতের উপকার করিব বলিয়া এই জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। আমি একবার একটি ধর্ম্ম-বক্তৃতায় পাঠ করি, "এই সুন্দর জগৎ অতি মঙ্গলময়, কারণ ইহাতে আমাদিগকে অপরকে সাহায্য করিবার সময় ও সুবিধা দেয়।" আপাততঃ শুনিতে ইহা অতি সুন্দর ভাব বটে, কিন্তু এক হিসাবে ইহা একটি অমঙ্গল-সূচক কথা; কারণ জগৎ আমার নিকট হইতে সাহায্য চাহে, এইরূপ ভাব কি নাস্তিকতাবিশেষ নহে ? অবশ্য জগতে যে যথেষ্ট দুঃখ আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; সুতরাং অপরকে যাইয়া সাহায্য করাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ নিয়ামক শক্তি, কিন্তু আমরা আখেরে দেখিব যে, উহা হইতে আমরাই উপকার পাইতেছি। বাল্যকালে আমার কতকগুলি শ্বেত ইঁদুর ছিল। একটি ছোট বাক্সের ভিতরে সেইগুলিকে রাখা হইয়াছিল, আর তাহাদের জন্য ছোট ছোট চাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইঁদুরগুলি সেই চাকা পার হইতে চেষ্টা করিত, অমনি চাকাগুলি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকিত; ইঁদুরগুলি আর কোথাও যাইতে পারিত না। জগৎ এবং উহাকে সাহায্য করাও তদ্রূপ। এইটুকু উপকার হয় যে, তোমার শিক্ষা হইয়া থাকে। এই জগৎ ভালও নহে, মন্দও নহে; প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের জন্য এক একটি জগৎ সৃষ্টি করে। অন্ধ ব্যক্তি যদি জগৎ সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ভ করে, তবে সে দেখিবে জগৎ হয় নরম বা শক্ত, ঠাণ্ডা বা গরম। আমরা এক রাশ

সুখ বা দুঃখের সমষ্টিমাত্র। আমরা জীবনে শত শত বার ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যুবারা প্রায় সুখবাদী (optimist) আর বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী (pessimist) হইয়া থাকে। যুবাদের সম্মুখে সারা জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে; বৃদ্ধেরা কেবল নিজ অবস্থার অনুশোচনা করিতেছে, তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে। শত শত বাসনা তাহাদের মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিতেছে, কিন্তু এক্ষণে তাহা পূরণের সামর্থ্য তাহাদের নাই—কাজেই জীবন তাহাদের পক্ষে ফুরাইয়া গিয়াছে।' এই উভয় সম্প্রদায়ই মূর্খ। এই জীবন ভালও নহে, মন্দও নহে; আমরা যেরূপ মন লইয়া জগৎকে দেখি, উহা সেইরূপই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা কাজের লোক যাঁহারা, তাঁহারা জগৎকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলিবেন না। অগ্নি জিনিসটি ভালও নয়, মন্দও নয়। যখন উহা আমাদিগকে বেশ গরমে রাখে, আমরা বলি অগ্নি কি সুন্দর! আবার যখন উহা আমাদের অঙ্গুলিকে দগ্ধ করে, তখন আমরা অগ্নিকে নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু অগ্নি বাস্তবিক ভালও নয়, মন্দও নয়। আমরা যেমন উহার ব্যবহার করি, উহাও সেইরূপ ভাল-মন্দ ভাব-উদ্দীপনা করিয়া দেয়; জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ। স্বয়ংসিদ্ধ অর্থে—উহা উহার সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। আমরা সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, জগৎ বেশ চলিয়া যাইবে, আমাদিগকে উহার উপকারের জন্য মাথা ঘামাইতে হইবে না।

তাহা হইলেও আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে; ইহাই আমাদের কার্য্যপ্রবৃত্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ নিয়ামক, কিন্তু আমাদের সর্ব্বদাই জানা উচিত যে, পরোপকার করিতে যাওয়া এক সৌভাগ্যের কার্য্য। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, 'দুটো পয়সা নে রে বেটা' বলিয়া গরীবকে উহা দিও না, বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে, সে গরীব হওয়াতে তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে সমর্থ হইতেছ। যে প্রতিগ্রহ করে সে ধন্য হয় না, দাতাই ধন্য হয়। তুমি যে তোমার দয়াশক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া আপনাকে পবিত্র ও সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছ, তজ্জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও। সব ভাল কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে। আমরা খুব জোর কি করিতে পারি?—না, একটা হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিলাম, রাস্তা করিয়া দিলাম বা দাতব্য আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিলাম। আমরা একটা চাঁদার খাতা খুলিয়া হয়ত বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলাম। তার দশ লক্ষ টাকায় একটা হাসপাতাল খুলিলাম, আর দশ লক্ষ নাচ-তামাসা-মদে গেল, আর বাকি দশ লক্ষের অর্দ্ধেক কর্ম্মচারীরা চুরি করিল, বাকিটা হয়ত গরীবদের কাছে পৌঁছিল। কিন্তু তাতেই বা হইল কি? এক ঝটকায় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়া যাইতে পারে। তবে করিব কি? এক আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত রাস্তা, হাসপাতাল, নগর, বাড়ী, সব উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। অতএব জগতের উপকার

করিব এই অজ্ঞানের কথা একেবারে পরিত্যাগ করি, এস। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে না। তথাপি আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে, সর্ব্বদাই লোকের উপকার করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদের পক্ষে মহা সৌভাগ্যস্বরূপ। কেবল এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হইতে পারি। কোন দরিদ্রই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তাহার সব ধারি; কারণ সে আমাদের সমুদয় দয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিয়াছে। আমরা জগতের কিছু উপকার করিয়াছি বা করিতে পারি, অথবা অমুক অমুক লোককে সাহায্য করিয়াছি—ইহা চিন্তা করা সম্পূর্ণ ভুল। ইহা বৃথা চিন্তা মাত্র, আর বৃথা চিন্তা কষ্টই আনয়ন করে। আমরা মনে করি, আমরা কাহাকেও সাহায্য করিয়াছি এবং সে আমাকে ধন্যবাদ দিবে এই আশা করি, আর সে ধন্যবাদ দিল না বলিয়াই আমাদের অশান্তি আসে। কেন আমরা প্রতিদান আশা করিব? যাহাকে তুমি সাহায্য করিতেছ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর। মানবকে সাহায্যরূপ ঈশ্বরোপাসনা করিতে পাওয়া কি আমাদের মহা সৌভাগ্য নহে? যদি আমরা বাস্তবিক অনাসক্ত হইতাম তবে আমরা এই বৃথা আশাজনিত কষ্ট অতিক্রম করিতে পারিতাম এবং তাহা হইলেই জগতে কিছু সৎকার্য্য করিতে পারিতাম। আসক্তিশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে অশান্তি বা কষ্ট কখনই আসিবে না। এই জগৎ সুখ-দুঃখ লইয়া অনন্তকাল

চলিতে থাকিবে এবং আমরা উহাকে সাহায্য করিবার জন্য কিছু করি বা না করি, তহোতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলিতেছি :

একজন গরীব লোক ছিল, তাহার কিছু অর্থের আবশ্যক ছিল। সে শুনিয়াছিল যে, যদি সে কোনরূপে একটি ভূত যোগাড় করিতে পারে, তবে সে তাহাকে আজ্ঞা করিয়া অর্থ বা যাহা কিছু চায় সবই পাইতে পারে। ইহা শুনিয়া সে একটি ভূত সংগ্রহ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। তাহাকে ভূত দিতে পারে এমন একটি লোক সে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল ; অবশেষে তাহার সহিত একজন মহা-যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সাধুর সাক্ষাৎ হইল। সে ঐ সাধুরই নিকট একটি ভূতের প্রার্থনা করিল। সাধু বলিলেন, "ভূত লইয়া তুমি কি করিবে ?" সে বলিল, "আমার একটি ভূতের আবশ্যক এই জন্য যে, সে আমার হইয়া কার্য্য করিবে। মহাশয়, কিরূপে আমি ভূত পাইব, উপদেশ করুন। আমার ভূতের বিশেষ আবশ্যক।" সাধু বলিলেন, "যাও, অত মাথা বকাইও না, বাড়ী যাও।" তার পরদিন সে পুনরায় সাধুর নিকট যাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো, আমাকে একটি ভূত দিতেই হইবে, আমার কাজের সাহায্যের জন্য আমার একটি ভূতের বিশেষ প্রয়োজন।"

অবশেষে সাধুটি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই মন্ত্র লও ; ইহা জপ করিলেই একটি ভূত আসিবে—তাহাকে যাহা

বলিবে, সে তাহাই করিবে। কিন্তু সাবধান, ভূত বড় ভয়ানক্ প্রাণী—উহাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত রাখিতে হয়; তাহাকে কাজ দিতে না পারিলেই সে তোমার প্রাণ লইবে।" সেই লোকটি বলিল, "ইহা ত অতি সহজ ব্যাপার, আমি তাহাকে তাহার সারা জীবনের জন্য কর্ম্ম দিতে পারি।" এই বলিয়া সে এক বনে গিয়া অনেক দিন ধরিয়া ঐ মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিল; জপ করিতে করিতে তাহার সম্মুখে বড় বড় দন্তযুক্ত এক ভীষণাকৃতি ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, "আমি ভূত—আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়াছি। কিন্তু তোমায় আমাকে সর্ব্বদা কাজ দিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে কাজ দিতে না পারিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তোমায় সংহার করিব।" সেই লোকটি বলিল, "আমার জন্য একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দাও।" ভূত বলিল, "হাঁ, হইয়াছে —প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।" লোকটি বলিল, "টাকা লইয়া আস।" ভূত বলিল, "এই টাকা লও।" লোকটি বলিল, "এই বন কাটিয়া এখানে একটি সহর বানাও।" ভূত বলিল, "তাহাও হইয়াছে, আর কিছু চাই?" তখন সেই লোকটি ভয় পাইতে লাগিল, বলিল, "ইহাকে আর কি কাজ দিব? এ ত দেখিতেছি, এক মুহূর্ত্তেই সব সম্পন্ন করে!" ভূত বলিল, "আমায় কিছু কাজ দাও, নইলে তোমায় খাইয়া ফেলিব।" তখন সে বেচারা ভূতকে আর কি কাজ দিবে ভাবিয়া না পাইয়া অতিশয় ভয় পাইল। ভয় পাইয়া দৌড়

মারিল। দৌড়—দৌড়—শেষে সাধুর নিকট পঁহুছিল, বলিল, "প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন।" সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" লোকটি বলিল, "ভূতকে আমি আর কিছু কাজ দিতে পারিতেছি না। আমি যা বলি তাই সে মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছে ; আর যদি তাহাকে কাজ না দিই, তাহা হইলে আমাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।" এমন সময়ে ভূত আসিয়া হাজির—বলিতেছে, "তোমায় খাইয়া ফেলিব—খাইয়া ফেলিব।" খায় আর কি ! লোকটি ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আর সাধুর নিকট আপনার জীবনরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। সাধু বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার এক উপায় করিতেছি ; ঐ কুকুরটিকে দেখিতেছ—কোঁকড়ান লেজ। তোমার তরবারিটি শীঘ্র বাহির করিয়া উহার লেজটি কাটিয়া ভূতটিকে উহা সোজা করিতে দাও।" লোকটি কুকুরটির লেজ কাটিয়া লইয়া ভূতকে দিয়া বলিল, "ইহা সোজা করিয়া দাও।" ভূত উহা লইয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সোজা করিল কিন্তু যাই সে ছাড়িয়া দিল, অমনি উহা গুটাইয়া গেল। ফের সে অতি কষ্টে সোজা করিল—আবার ছাড়িয়া দিতেই গুটাইয়া গেল। এইরূপে দিনের পর দিন সে পরিশ্রম করিতে লাগিল। অবশেষে সে ক্লান্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার জীবনে কখনও আমি এমন যন্ত্রণায় পড়ি নাই। আমি একজন পুরাতন পাকা ভূত, কিন্তু জীবনে কখনও এমন কষ্টে পড়ি নাই। এস, তোমার সঙ্গে রফা করি। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও,

আমিও তোমাকে যাহা যাহা দিয়াছি সবই রাখিতে দিব, আর প্রতিজ্ঞা করিব কখনও তোমার অনিষ্ট করিব না।" লোকটি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দের সহিত এই চুক্তিতে স্বীকার পাইল।

এই জগৎই সেই কুকুরের কোঁকড়ান লেজ; লোকে শত শত বৎসর ধরিয়া উহা সোজ করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু যখনই তাহারা উহা ছাড়িয়া দেয়, উহা আবার গুটাইয়া যায়। ইহা ব্যতীত আর কি হইবে? প্রথমে লোকের জানা উচিত, আসক্তি-শূন্য হইয়া কি করিয়া কাজ করিতে হয়। তাহা হইলেই তাহার আর গোঁড়ামি আসিবে না। যখন আমরা জানিতে পারিব এই জগৎ কুকুরের লেজ, আর উহা কখন সোজা হইবে না, তখনই আমরা আর গোঁড়া হইব না।

অনেক প্রকারের গোঁড়া আছে—মদ্যপান-নিবারক, চুরুট-নিবারক প্রভৃতি। এক সময়ে এই ক্লাসে একজন যুবতী মহিলা আসিতেন। তিনি এবং আর কয়েকজন মহিলা মিলিয়া চিকাগোয় একটি বাড়ী করিয়াছেন; তথায় শ্রমজীবীদের কিছু কিছু সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিখিবার বন্দোবস্ত আছে। একদিন তিনি আমাকে মদ্যপান ও ধূমপান প্রভৃতিতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই সকল দোষের প্রতিকারের উপায় তিনি জানেন।" আমি সেই উপায়টি কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "আপনি কি হল্-বাড়ীটির কথা জানেন না?"

ইহার কথা শুনিয়া মনে হয় যেন ইহার মতে মানবজাতির যাহা কিছু অশুভ, ঐ 'হল্-বাড়ী'টি তাহার অব্যর্থ মহৌষধ। ভারতে কতকগুলি গোঁড়া আছেন, তাঁহারা মনে করেন, যদি স্ত্রীলোককে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া যায়, তবেই সব দুঃখ ঘুচিবে। এই সবই গোঁড়ামি, আর জ্ঞানী ব্যক্তি কখন গোঁড়া হইতে পারেন না।

গোঁড়ারা প্রকৃত কার্য্য করিতে পারে না। জগতে যদি গোঁড়ামি না থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করিত। গোঁড়ামিতে জগতের উন্নতি হয় ভাবা কেবল খাঁটি অজ্ঞতামাত্র। উহাতে বরং জগতের উন্নতির বিঘ্ন হয়, কারণ উহাতে ঘৃণা-ক্রোধাদির উৎপত্তি হয়, আর লোকে পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে। গোঁড়ামি মানুষকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে দেয় না। আমরা যাহা করি বা আমাদের যাহা আছে তাহাই আমরা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করি, আর যেগুলি আমাদের নাই সেগুলি কোন কাজেরই নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করি।

অতএব যখনই তোমার গোঁড়া হইবার ভাব আসিবে, তখন সর্ব্বদাই সেই কুকুরের লেজের কথা মনে করিও। জগতের জন্য তোমার ব্যস্ত হইবার অথবা নিদ্রাশূন্য হইবার আবশ্যক নাই; উহা ঠিক চলিয়া যাইবে। প্রভু পরমেশ্বর এই জগতের শাসনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। সুতরাং এই সকল

বিভিন্ন প্রকার গোঁড়ারা যাহাই বলুক না কেন, তিনিই ইহার সুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। যখন তোমার এই গোঁড়ামি চলিয়া যাইবে, তখনই তুমি প্রকৃত কার্য্য করিতে পারিবে। যাহার মাথা খুব ঠাণ্ডা, সে শান্ত, সর্ব্বদা উত্তমরূপে বিচার করিয়া কার্য্য করে; যাহার স্নায়ু সহজে উত্তেজিত হয় না এবং যে অতিশয় প্রেম ও সহানুভূতি-সম্পন্ন, সেই লোকই সংসারে মহৎ কার্য্য করিতে এবং তদ্দারা নিজেরও কল্যাণসাধন করিতে পারে। গোঁড়ারা নির্ব্বোধ, তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই; তাহারা জগৎকে ত সোজা করিতে পারেই না, নিজেরাও পবিত্রতা ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

তোমাদের নিজেদের ইতিহাসে 'মে-ফ্লাওয়ার' জাহাজ হইতে আগত ব্যক্তিদিগের কথা কি স্মরণ নাই? যখন তাঁহারা প্রথমে এদেশে আসেন, তখন তাঁহারা 'পিউরিট্যান' এবং খুব পবিত্র ও সাধু-প্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁহারা অপর ব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায়। যাঁহারা নিজেরা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া আসেন, তাঁহারাই আবার সুবিধা পাইলে অপরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। আমি দুইটি অদ্ভুত জাহাজের কথা শুনিয়াছি—প্রথম 'নোয়ার-আর্ক' ও দ্বিতীয় 'মে-ফ্লাওয়ার'। য়াহুদীরা বলেন, সমুদয় সৃষ্টি 'নোয়ার-আর্ক' হইতে আসিয়াছে; আর মার্কিনেরা

বলেন, জগতের প্রায় অর্দ্ধেক লোক ‘মে-ফ্লাওয়ার’ জাহাজ হইতে আসিয়াছে। এদেশে যাহার সহিত দেখা হয়, এমন খুব কম লোকই দেখিতে পাই, যে না বলে তাহার পিতামহ বা প্রপিতামহ ‘মে-ফ্লাওয়ার’ জাহাজ হইতে আসেন নাই। এ আর এক রকমের গোঁড়ামি। গোঁড়াদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ নব্বই জনের যকৃৎ দূষিত, অথবা তাহারা অজীর্ণরোগগ্রস্ত, অথবা তাহাদের কোন না কোন প্রকার ব্যাধি আছে। ক্রমশঃ চিকিৎসকেরাও বুঝিবেন যে, গোঁড়ামি একপ্রকার রোগবিশেষ—আমি ইহা যথেষ্ট দেখিয়াছি। প্রভু আমাকে ইহা হইতে রক্ষা করুন।

এই গোঁড়ামি সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে মোটামুটি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের কোনপ্রকার গোঁড়া বা একঘেঁয়ে সংস্কারকার্য্যের সহিত মিশিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা কি বলিতে চাও যে, মদ্যপান-নিবারক গোঁড়ারা মাতাল বেচারাদের বাস্তবিক ভালবাসে? গোঁড়াদের গোঁড়ামির কারণ এই যে, তাহারা এই গোঁড়ামি করিয়া নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবামাত্র ইহারা লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়। এই গোঁড়ার দল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কিরূপে ভালবাসিতে হয় ও সহানুভূতি করিতে হয়, তাহা শিখিবে। তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহানুভূতি করা সম্ভব হইবে; তখনই বুঝিবে,

সেও তোমাদের মত একজন মানুষ। তখনই তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, নানা অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; আর বুঝিবে, যদি তুমি তাহার ন্যায় অবস্থায় পড়িতে, তুমি হয়ত অত্মহত্যা করিতে। আমার একটি স্ত্রীলোকের কথা মনে হইতেছে—তাহার স্বামী ছিল ঘোর মাতাল। স্ত্রীলোকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত পানদোষ সম্বন্ধে অভিযোগ করিত। আমার কিন্তু নিশ্চিত ধারণা—অধিকাংশ লোক তাহাদের স্ত্রীর দোষে মাতাল হইয়া থাকে। তোষামোদ করা আমার কার্য্য নহে, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে সকল অবাধ্য রমণীগণের মন হইতে সহ্যগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকে যে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুষ্টির ভিতর রাখিবে, আর যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলিয়া থাকে তখনই চীৎকার করিতে থাকে—এরূপ রমণীগণ জগতের মহা অকল্যাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্দ্ধেক লোক যে এখনও কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই রমণীগণ তাহাদের অর্দ্ধাশন-পীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে, আর তাহারাও বলিতেছে, "মহিলাগণ, আপনারাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত জীব।" তখন আবার ঐ রমণীগণ এই প্রচারকগণ সম্বন্ধে বলিতে

থাকে—'ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক'; আর তাহাকে টাকাকড়ি ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি দিতে থাকে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। কিন্তু জীবনটা ত এরূপ একটা তামাসা নহে, উহার মধ্যে গভীরভাবে প্রণিধান ও আলোচনা করিবার বিষয় অনেক আছে।

এক্ষণে তোমাদিগকে অদ্যকার বক্তৃতার মুখ্য মুখ্য বিষয়গুলি স্মরণ করিতে বলিতেছি। প্রথমতঃ, আমাদিকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সকলেই জগতের নিকট ঋণী, জগৎ আমাদের নিকট কোনরূপেই ঋণী নহে। আমাদের সকলেরই ইহা মহা সৌভাগ্য যে, আমরা জগতের জন্য কিছু করিবার সুযোগ পাইয়াছি। জগৎকে সাহায্য করিতে গিয়া আমরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরই কল্যাণ করিয়া থাকি। দ্বিতীয় কথা, এইটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের একজন ঈশ্বর আছেন। ইহা সত্য নহে যে, এই জগৎ তোমার আমার সাহায্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ঈশ্বর এখানে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন। তিনি অবিনাশী, নিয়তক্রিয়াশীল, সদা জাগরিত ও অবহিত। যখন সমগ্র জগৎ নিদ্রা যায়, তখনও তিনি জাগরিত থাকেন। তিনি প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছেন। জগতে যে কিছু পরিবর্ত্তন ও বিকাশ দেখা যায়, সবই তাঁহার কার্য্য। তৃতীয়তঃ, আমাদের কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। এই জগৎ চিরকালই শুভাশুভের মিশ্রণস্বরূপ থাকিবে। আমাদের কর্ত্তব্য—

দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশ, অন্যায় কর্ম্মকারীকেও ভালবাসা। এ জগৎ একটি প্রকাণ্ড নৈতিক ব্যায়াম-ক্ষেত্র —এখানে আমাদিগের সকলকেই অভ্যাসরূপ ব্যায়াম করিতে হয়, যাহাতে দিন দিন আমরা আধ্যাত্মিক বল লাভ করিতে পারি। চতুর্থতঃ, আমাদের কোন প্রকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নহে, কারণ গোঁড়ামি প্রেমের বিরোধী। গোঁড়ারা ফস্ করিয়া বলিয়া বসে—'আমি পাপীকে ঘৃণা করি না, পাপকে ঘৃণা করি।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ ও পাপীর মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে এমন লোককে দেখিবার জন্য আমি দূর দূরান্তরে যাইতেও প্রস্তুত। কথা ত বলা খুব সহজ। যদি আমরা উত্তমরূপে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারি, তবে ত আমরা সিদ্ধ হইয়া যাই। ইহা কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজ নহে। আরও, যতই আমরা শান্তচিত্ত হইব এবং আমাদের স্নায়ুসমূহও যত শান্ত হইবে, ততই আমরা অধিকতর প্রেমসম্পন্ন হইব এবং ততই আমরা ভাল ভাল কার্য্য করিতে সমর্থ হইব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

যেমন আমাদের ভিতর হইতে বহির্গত অর্থাৎ আমাদের কায়মনোবাক্য দ্বারা কৃত প্রত্যেক কার্য্যই আবার ফলরূপে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কার্য্য অপর ব্যক্তির উপর এবং তাহাদের কার্য্য আমাদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তোমরা হয়ত সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, যখন লোকে কোন অন্যায় কার্য্য করে তখন সে ক্রমশঃ খারাপের পর খারাপ হইতে থাকে এবং সৎকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে তাহার অন্তরাত্মা দিন দিন সবল হইতে সবলতর হইতে থাকে— সর্ব্বদাই তাহার ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি হইতে থাকে। এইরূপ কর্ম্মের শক্তিবৃদ্ধি আর কোন উপায়েই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, কেবল এক মন আর এক মনের উপর কার্য্য করে—এই তত্ত্বের দ্বারাই উহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে একটি উপমা গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, আমি যখন কোন কার্য্য করিতেছি তখন আমার মন একরূপ নির্দ্দিষ্ট কম্পন-বিশিষ্ট রহিয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন সকল মনই আমার মন দ্বারা প্রভাবিত হইবার উপক্রম করে। যদি কোন গৃহে এক সুরে বাঁধা বিভিন্নরূপ

বাদ্যযন্ত্র থাকে, তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, তাহার একটিতে আঘাত করিলেই অপরগুলিরও সেই সুরে বাজিবার উপক্রম হইয়া থাকে। একটিকে উদাহরণস্বরূপ ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ যন্ত্রগুলি একসুরে বাঁধা ছিল, সুতরাং একরূপ শক্তি উহাদের উপর একরূপ কার্য্য করিয়াছিল। এইরূপ যে সকল মন একসুরে বাঁধা, একরূপ চিন্তা তাহাদের উপর একরূপ কার্য্য করিবে। অবশ্য দূরত্ব অনুসারে কার্য্যের তারতম্য হইবে, কিন্তু মনগুলি প্রভাবিত হইবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা থাকিবে। মনে কর, আমি কোন অসৎ কার্য্য করিতেছি, আমার মন কোন বিশেষ-প্রকার কম্পন-বিশিষ্ট রহিয়াছে; তাহা হইলে জগতের সেইরূপ কম্পন-বিশিষ্ট সকল মনগুলি আমার মনের দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা হইবে। এইরূপ যখন আমি কোন সৎকার্য্য করিতেছি, তখন আমার মন আর এক সুরে বাঁধা বুঝিতে হইবে, আর এইরূপ সুরে বাঁধা সকল মনগুলির ঐরূপে প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা হইবে; আর যেমন যেমন সুরে বাঁধা থাকিবে, উহার উপর তেমন তেমন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা হইবে।

পূর্ব্বোক্ত উপমাটি লইয়া আরও একটু অগ্রসর হইলে বুঝা যাইবে যে, আলোক-তরঙ্গগুলি যেমন তাহাদের গন্তব্য বস্তুর নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারে, খুবসম্ভব এইরূপ এই চিন্তাতরঙ্গগুলিও যতদিন না এমন এক পদার্থকে লাভ করে, যাহার সহিত একযোগে কার্য্য

করিতে পারে, ততদিন হয়ত শত শত বর্ষ শূন্যে ভ্রমণ করিবে। সুতরাং খুব সম্ভব যে, আমাদের এই বায়ুমণ্ডল এইরূপ ভাল-মন্দ নানাপ্রকার চিন্তাতরঙ্গে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রত্যেক মস্তিষ্কের প্রত্যেক চিন্তাই যেন এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যতদিন না উহা একটি আধার প্রাপ্ত হয়। যে কোন চিত্ত এইরূপ চিন্তাসমূহকে প্রাপ্ত হইবার জন্য আপনাকে উন্মুক্ত করিয়াছে, সে চিত্ত শীঘ্রই উহা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং যখন কেহ কোন অসৎ কার্য্য করে, সে তখন তাহার মনকে এক বিশেষপ্রকার সুরে লইয়া যায়; আর সেই সুরের যতগুলি তরঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহারা তাহার মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই জন্যই কোন অসৎকার্য্যকারী সাধারণতঃ দিন দিন অৎসকার্য্যই করিতে থাকে। তাহার কার্য্য ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। এইরূপ শুভকর্ম্মীর পক্ষেও বুঝিতে হইবে। তাঁহারও আকাশস্থ সমুদয় শুভতরঙ্গগুলি দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহার শুভকর্ম্ম-গুলিও অধিক শক্তিলাভ করিবে। অতএব অসৎ কার্য্য করিতে গেলে দুই প্রকার বিপদ আমরা ডাকিয়া আনি—প্রথমতঃ, আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ সমুদয় অসৎ প্রভাবগুলিতে আমরা যেন গা ঢালিয়া দিই; দ্বিতীয়তঃ, আমরা নিজেরা অশুভ তরঙ্গসকল সৃষ্টি করিয়া থাকি, যাহারা অপরকে আক্রমণ করিতে পারে। হইতে পারে যে, আমাদের অশুভ কার্য্য

শত শত বৎসর পরে অপরকে আক্রমণ করিবে। অসৎকার্য্য করিলে আমরা আমাদের নিজেদের এবং অপরেরও অনিষ্ট করি। সৎকার্য্য করিলে আমরা আমাদের নিজেদের এবং অপরেরও উপকার করি। মনুষ্যের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য শক্তির ন্যায় এই সদসৎ শক্তিদ্বয়ও বাহির হইতে বল সঞ্চয় করে।

কর্ম্ম-যোগ মতে কর্ম্ম ফলপ্রসব না করিয়া কখনই নষ্ট হইতে পারে না; প্রকৃতির কোন শক্তিই উহার ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। আমি কোন অসৎ কার্য্য করিলে আমি তাহার জন্য ভুগিব, জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা উহাকে রোধ করিতে পারে; এইরূপ কোন ভাল কাজ করিলেও জগতে কোন শক্তিই উহার শুভ ফলপ্রসব রোধ করিতে পারে না। কারণের কার্য্য হইবেই; কিছুই উহাকে রোধ করিতে পারে না। এক্ষণে কর্ম্ম-যোগ সম্বন্ধে একটি সূক্ষ্ম ও গুরুতর চিন্তার বিষয় আসিতেছে। আমাদের এই সদসৎ কর্ম্ম পরস্পরের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। আমরা একটি প্রভেদরেখা টানিয়া দিয়া বলিতে পারি না— এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাল, আর এইটি সম্পূর্ণ মন্দ। এমন কোন কাজ নাই যাহা এককালে শুভ অশুভ উভয় ফলই প্রসব না করে। খুব নিকটবর্ত্তী উদাহরণ লওয়া যাক: আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি; তোমাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছে, আমি ভাল কাজ করিতেছি, কিন্তু ঐ সময়েই হয়ত আমি বায়ুস্থ সহস্র সহস্র কীটাণুর ধ্বংসের কারণ

হইতেছি। সুতরাং আমি কতক প্রাণী সম্বন্ধে অনিষ্ট করিতেছি। আমাদের নিকটস্থ কতকগুলি ব্যক্তি যাহাদিগকে আমরা জানি, তাহাদের প্রতি যখন উহা শুভ প্রভাব বিস্তার করে, তখন আমরা উহাকে ভাল কাজ বলি। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমার এই বক্তৃতা তোমরা ভাল বলিবে, কীটাণুগণ কিন্তু তাহা বলিবে না। কীটাণুগুলিকে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের উপর আমার বক্তৃতার প্রভাব প্রত্যক্ষ, কিন্তু কীটাণুগণের প্রতি নহে। এইরূপে যদি আমরা আমাদের অসৎ কার্য্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে দেখিব উহাতে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু শুভ ফল হইয়াছে। "যিনি শুভ কর্ম্মের মধ্যে কিছু অশুভ, আবার অশুভের মধ্যে কিঞ্চিৎ শুভ দেখেন, তিনি প্রকৃত কর্ম্মরহস্য বুঝিয়াছেন।"

ইহা হইতে আমরা পাইলাম কি? পাইলাম এই—আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহা সম্পূর্ণ পবিত্র অথবা সম্পূর্ণ অপবিত্র—এখানে 'পবিত্রতা' অথবা 'অপবিত্রতা', হিংসা বা অহিংসা এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা অপরের অনিষ্ট না করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসত্যাগ বা জীবনধারণ করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেক অন্নমুষ্টি অপরের মুখ হইতে কাড়িয়া লওয়া। আমরা বাঁচিয়া জগৎ জুড়িয়া থাকার দরুণ অপর কতকগুলি

প্রাণীর কষ্ট হইতেছে—হইতে পারে মানুষ অথবা অপর প্রাণী অথবা কীটাণু—কিন্তু যাহারই হউক না, আমরা কোন না কোন প্রাণীর স্থান সঙ্কোচ করিবার কারণ হইয়াছি। তাহাই যদি হইল, তবে স্বভাবতঃই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম দ্বারা কখনও পূর্ণতা লাভ হয় না। আমরা অনন্তকাল কাজ করিয়া যাইতে পারি, কিন্তু এই জটিল সংসারযন্ত্র হইতে বাহির হইবার পথ পাইব না; তুমি ক্রমাগত কাজ করিয়া যাইতে পার, কাজের অন্ত পাইবে না।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় এই, কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ লোকের এই বিশ্বাস যে, এক সময় এই জগৎ পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন ব্যাধি, মৃত্যু, অসুখ বা অসাধুতা থাকিবে না। ইহা খুব ভাল কথা বটে, অজ্ঞেরা এই বিশ্বাসের বলে কার্য্যে প্রণোদিত হইতে পারে বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত যদি আমরা ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিব, এরূপ অবস্থা কখনও হইতেই পারে না। কিরূপে ইহা হইতে পারে?—ভাল-মন্দ যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ভাল হইতে গেলেই মন্দ না হইলে কিরূপে চলিবে? পূর্ণতার অর্থ কি? সম্পূর্ণ জীবন একটি স্ব-বিরুদ্ধ বাক্যমাত্র। জীবন—প্রত্যেক বহির্ব্বস্তুর সহিত আমাদের নিয়ত যুদ্ধের অবস্থা। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছি। যদি আমরা ইহাতে পরাস্ত হই, আমাদের জীবন যাইবে। আহার ও বায়ুর জন্য প্রতিনিয়ত

চেষ্টার নাম জীবন। উহাদের না পাইলেই আমরা মরিব। জীবন একটা সাদাসিদা ব্যাপার নহে, উহা একটি রীতিমত জটিল ব্যাপার। এই বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগতের মধ্যে যে ক্রমাগত যুদ্ধ, তাহাকেই আমরা জীবন বলি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—এই যুদ্ধ শেষ হইলেই জীবন শেষ হইবে।

পূর্ব্বে যে আদর্শ সুখের কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, এই সংগ্রাম একেবারে শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে জীবনও শেষ হইবে। জীবনের অন্ত হইলেই কেবল সংগ্রামের শেষ হইবার সম্ভাবনা। আবার এই অবস্থার সহস্র ভাগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এই জগৎ শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমরা থাকিব না। অতএব অন্য কোন লোকে হয় হউক, এই জগতে এই সত্যযুগ—এই আদর্শ যুগ—কখনই আসিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য্য করি তাহার মুখ্য ফল—আমাদের আত্মশুদ্ধি। সর্ব্বদা অপরের কল্যাণের চেষ্টা করিতে যাইয়া আমরা আপনাদিগকে ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের জীবনে এই এক প্রধান শিক্ষার বিষয়—আত্মবিস্মৃতি। মানুষ অজ্ঞের ন্যায় মনে করে যে, সাধারণ উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে পারে। বহু বর্ষ চেষ্টার পর সে অবশেষে দেখিতে পায়, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার

নাশে; আর সে নিজে আপনাকে সুখী না করিলে কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

প্রত্যেক পরোপকার-কার্য্য, অপরের প্রতি সহানুভূতির প্রত্যেক চিন্তা, অপরকে আমরা যাহা কিছু সাহায্য করি—এই সমুদয় সৎকার্য্য আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'কে কমাইতেছে। ঐ গুলিতে আমাদের আপনার ভাবনা খুব কমাইয়া দেয়, সুতরাং উহারা সৎকার্য্য। এই স্থানে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী একমত। সর্ব্বোচ্চ আদর্শ—অনন্তকালের জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ, যেখানে কোন 'আমি' নাই, সব 'তুমি'। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কর্ম্ম-যোগ আমাদিগকে ঐ স্থানেই লইয়া যায়।

একজন ধর্ম্মপ্রচারক নির্গুণ ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ভয় পাইতে পারেন। তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন, ঈশ্বর সগুণ—ব্যক্তিবিশেষস্বরূপ, আর তিনি নিজের নিজত্ব, নিজের ব্যক্তিত্ব (এইগুলির তাৎপর্য্য তিনি যাহাই বুঝুন) অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা যদি যথার্থই ভাল হয়, তবে উহা সর্ব্বোচ্চ আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ইহাই সমুদয় নীতির ভিত্তি। এই আত্মত্যাগই সমুদয় নীতিপ্রণালীর মধ্যে একমাত্র মূলতত্ত্ব—ইহাই প্রধান ভাব। তোমরা ঐ ভাবকেই মনুষ্যে, পশুতে বা দেবতায়, সর্ব্বত্র সমভাবে একমাত্র 'মাপকাঠি'রূপে প্রয়োগ করিতে পার।

এই আত্মত্যাগের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ জগতে অনেক

প্রকারের লোক দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ, দেব-প্রকৃতি লোক—ইঁহারা পূর্ণ আত্মত্যাগী, ইঁহারা নিজেদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অপরের উপকার করেন। ইঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য। যদি কোন দেশে এইরূপ একশত লোক থাকেন, সেই দেশের কোন ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ, সাধুলোক—ইঁহারা ততক্ষণ লোকের উপকার করেন, যতক্ষণ না উহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয়। তারপর তৃতীয় শ্রেণীর লোক—অসুর-প্রকৃতি। ইঁহারা নিজেদের হিতের জন্য অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকেন। আর কথিত আছে যে, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকেন। সর্ব্বোচ্চ স্তরে যেমন দেখা যায় সাধু-মহাত্মাগণ ভালর জন্যই ভাল করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সর্ব্বনিম্ন স্তরে এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা কেবল অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহারা উহা হইতে কিছু লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু ঐ অনিষ্ট করাই তাঁহাদের স্বভাব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, যে ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্য নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন, যিনি সম্পূর্ণ আত্মত্যাগী, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত শব্দ দুইটি লইয়া বিচার কর। একটি—'প্রবৃত্তি' অর্থাৎ সেই দিকে বর্ত্তিত হওয়া, অর্থাৎ ঘুরিয়া যাওয়া; আর একটী—'নিবৃত্তি' তথা হইতে বর্ত্তিত হওয়া অর্থাৎ ঘুরিয়া আসা। সেইদিকে বর্ত্তিত হওয়া

অর্থাৎ যাহাকে আমরা সংসার বলি, তাহা এই 'আমি-আমার' —এই 'আমি'কে টাকা-কড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বারা সর্ব্বদাই বাড়াইবার চেষ্টা। যাহা পাওয়া যায় তাহাই ধরা, গ্রহণ করা—সর্ব্বদাই সব জিনিসই এই 'আমি'-রূপ কেন্দ্রের দিকে জড় করা। ইহাই প্রবৃত্তি—ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাভাবিক ভাব, চারিদিক হইতে প্রত্যেক জিনিস লওয়া এবং এক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে জড় করা। সেই কেন্দ্র তাহার নিজের মধুর 'আমি'। যখন ইহা ভাঙ্গিতে থাকে, যখন নিবৃত্তির (সেই দিক হইতে চলিয়া যাওয়ার) উদয় হয়, তখনই নীতি এবং ধর্ম্ম আরম্ভ হয়। 'প্রবৃত্তি', 'নিবৃত্তি' উভয়ই কার্য্য; একটি অসৎ, অপরটি সৎ। এই নিবৃত্তিই সমুদয় নীতি এবং সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। আর উহার পূর্ণতাই সম্পূর্ণ 'আত্মত্যাগ' —অপরের জন্য' মন, শরীর, এমন কি, সমুদয় ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা। যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে, তখনই মানুষ কর্ম্ম-যোগে সিদ্ধিলাভ করে। সৎকার্য্যের ইহাই সর্ব্বোচ্চ ফল। এক ব্যক্তি সমুদয় জীবনে হয়ত একখানি দর্শনও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়ত কোনরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই এবং এখনও করেন না, তিনি হয়ত সারা জীবনের মধ্যে একবারও প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেবল সৎকর্ম্মের শক্তিতে তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায়, যেখানে তিনি অপরের জন্য তাঁহার জীবন এবং অন্য যাহা কিছু সবই ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে

বুঝিতে হইবে জ্ঞানী যেখানে জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত যেখানে উপাসনা দ্বারা উপনীত হইয়াছেন, তিনিও সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং তোমরা দেখিলে জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত সকলেই একস্থানে উপনীত হইলেন—একই স্থানে মিলিত হইলেন। এই একস্থান—আত্মত্যাগ। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও ধর্ম্মের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, যে ব্যক্তি অপরের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েন, তাঁহার সমক্ষে সকল মনুষ্যই ভয়-ভক্তিসহকারে দণ্ডায়মান হয়। এখানে কোন প্রকার মতামতের কথা নাই—এমন কি, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মভাবের বিরোধী, তাঁহারা পর্য্যন্ত যখন এইরূপ সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনের কার্য্য দেখিতে পান, তখন উহার উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইয়া থাকিতে পারেন না। তোমরা কি দেখ নাই, খুব গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানও যখন এড্‌উইন আর্ণল্ডের 'এশিয়ার আলোক' (Light of Asia) পাঠ করেন, তখন তিনিও বুদ্ধের প্রতি কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন—যে বুদ্ধ একমাত্র আত্মত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বরবাদ বা আর কিছুই প্রচার করেন নাই। গোঁড়া কেবল জানে না যে, তাহার নিজ জীবনের উদ্দেশ্যও যাহা, যাহাদের সহিত তাহার বিরোধ তাহাদের জীবনোদ্দেশ্যও ঠিক তাহাই। উপাসক সর্ব্বদা মনে ঈশ্বরের ভাব এবং সাধুভাব রক্ষা করিয়া অবশেষে সেই একই স্থানে উপনীত হন এবং বলেন—'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। ইহা আত্মত্যাগ বই আর কি? জ্ঞানী

জ্ঞানের দ্বারা দেখেন, এই আপাতপ্রতীয়মান 'আমি' ভ্রমমাত্র; সুতরাং তিনি সহজেই উহা পরিত্যাগ করেন। যাহা হউক, ইহাও সেই আত্মত্যাগ বই আর কিছুই নহে। অতএব কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের এখানে সমন্বয় হইল। আর প্রাচীন কালের বড় বড় ধর্ম্মপ্রচারকেরা 'ভগবান জগৎ নহেন' এই যে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মও এই। জগৎ এক জিনিস আর ভগবান এক জিনিস—ইহা খুব সত্য। জগৎ অর্থে তাঁহারা স্বার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। নিঃস্বার্থতাই ভগবান। এক ব্যক্তি স্বর্ণময় প্রাসাদে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ হইলেই তাঁহাকে ব্রহ্মে স্থিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপরের হয়ত কুটীরে বাস, ছিন্নবসন পরিধান এবং সংসারে কিছুই নাই; তথাপি সে যদি স্বার্থপর হয় তবে সে বিশেষরূপে সংসারে মগ্ন হইতেছে বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা যাউক। আমরা বলিতেছি, ভাল করিতে গেলেই আমরা কিছু মন্দ এবং মন্দ করিতে গেলেই তৎসঙ্গে কিছু ভাল না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা জানিয়া আমরা কার্য্য করিব কিরূপে? এই তত্ত্বের মীমাংসার চেষ্টায় এই জগতের অনেকগুলি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যাঁহারা বেপরোয়া হইয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে আত্মহত্যাই সংসার হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়। কারণ জীবনধারণ

করিতে গেলেই মানবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু ও বৃক্ষলতাকে নষ্ট করিতে হইবে, অথবা কাহারও না কাহারও অনিষ্ট করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে সংসারচক্র হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—মৃত্যু। জৈনগণ ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আপাততঃ এই উপদেশ খুব যুক্তি ও ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গীতাতে ইহার প্রকৃত মীমাংসা পাওয়া যায়—নির্লিপ্ততা, কিছুতেই লিপ্ত না হওয়া। জানিয়া রাখ যে, তুমি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; তুমি জগতে রহিয়াছ বটে, কিন্তু যাহাই কর না কেন তাহা নিজের জন্য করিতেছ না। নিজের জন্য যে কার্য্য করিবে, তাহার ফল তোমার নিজের উপর বর্ত্তিবে। যদি সৎকার্য্য হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ করিতে হইবে, অসৎ হইলে উহার অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে কোন কার্য্যই হউক তাহা যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না হয়, তাহা হইলে তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। "যদি কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি সমুদয় জগৎকে হত্যা করিয়াও বা নিজে হত হইয়াও হত্যা করেন না বা হত হন না।" এইজন্যই কর্ম্ম-যোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয় যে, সংসার ত্যাগ করিও না—সংসারে বাস কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা গ্রহণ কর; কিন্তু ভোগের জন্য কি?—না, একেবারেই নহে। ভোগ যেন তোমার চরম লক্ষ্য না হয়।

প্রথমে 'নিজ'কে মারিয়া ফেল, তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার মত দেখ। যেমন প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানেরা বলিতেন, "প্রাচীন মনুষ্যটিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।" 'প্রাচীন মনুষ্য' অর্থে—আমাদের মনের এই স্বার্থপর ভাব যে, জগৎ আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। অজ্ঞ পিতামাতারা তাঁহাদের বালক-বালিকাদিগকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন—"হে প্রভো, তুমি এই সূর্য্য, এই চন্দ্র আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ"—যেন প্রভুর এই সকল শিশুর জন্য সব সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। ইহা আমাদের কামনারূপ অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করা মাত্র। ছেলেদিগকে এমন বাজে কথা শিখাইও না। তারপর আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আবার অন্য ধরণের আহাম্মক। তাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, এই সকল জন্তুর সৃষ্টি কেবল আমরা যাহাতে তাহাদিগকে মারিয়া খাইতে পারি তজ্জন্য, আর এই জগৎ মানুষের ভোগের জন্যই রহিয়াছে। এও একটা প্রকাণ্ড আহাম্মকি। ব্যাঘ্রও বলিতে পারে, "হে প্রভো, মানুষগুলি কি দুষ্ট যে, তাহারা আমাদের সম্মুখে ভুক্ত হইবার জন্য আসে না, উহারা তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে।" যদি জগৎ আমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে, আমরাও জগতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছি। এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—এই ভয়ানক কুৎসিৎ ধারণাই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই জগৎ আমাদের জন্য নহে। লক্ষ লক্ষ

লোক প্রতিবৎসর জগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে, জগতের সেদিকে খেয়ালই নাই। আর লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে। যেমন জগৎ আমাদের জন্য, আমরাও তেমনি জগতের জন্য।

অতএব কার্য্য করিবার সময় আসক্তির ভাব ত্যাগ কর। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মের ভিতর নিজেকে জড়াইও না; নিজে সাক্ষি-স্বরূপ অবস্থিত হও এবং কর্ম্ম করিয়া যাও। কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "আপনার ছেলেদের উপরে ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর।" ধাত্রী তোমার শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেলা করিবে আর তাহাকে নিজের ছেলের মত অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করিবে, কিন্তু তাহাকে বিদায় দিবামাত্র সে গাঁট-গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হয়। তোমার ছেলের প্রতি তাহার যে এত ভালবাসা ছিল, সে সবই ভুলিয়া যায়। সাধারণ ধাত্রীর পক্ষে তোমার ছেলে ছাড়িয়া পরের ছেলে লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তুমিও তোমার নিজের ছেলেদের প্রতি এইরূপ ভাব ধারণ কর। তুমি উহাদের ধাত্রী, আর তুমি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও তবে বিশ্বাস কর যে, সবই তাঁহার। অত্যধিক দুর্ব্বলতাই অনেক সময় খুব সাধুতা ও সবলতার আকার ধারণ করে। আমার উপর একজন নির্ভর করে এবং আমি একজনের উপকার করিতে পারি, ইহা ভাবাই অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। এই অহঙ্কার হইতেই সর্ব্বপ্রকার আসক্তি এবং আসক্তি হইতেই সমুদয় দুঃখের উদ্ভব। আমাদের মনকে

আমাদের জানান উচিত যে, এই জগতের মধ্যে কেহই আমাদের উপর নির্ভর করে না—একজন গরীবও আমাদের দানের উপর নির্ভর করে না, একটি আত্মাও আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করে না, কেহই আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। আমরা কোটি কোটি লোক যদি না থাকি তথাপি তাহারা সাহায্য পাইয়া থাকে, পাইবেও। তোমার আমার জন্য প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকিবে না। আমরা যে অপরকে সাহায্য করিয়া নিজেরা শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছি, ইহাই তোমার আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। সমস্ত জীবন এই এক শিক্ষাই আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। যখন আমরা ইহা পূর্ণরূপে শিক্ষা করিতে পারিব, তখন আর আমরা অসুখী থাকিব না; তখন আমরা যাইয়া যেখানে সেখানে মিশিতে পারিব। তোমার পতি থাকিতে পারে, পত্নী থাকিতে পারে, এক পাল চাকর থাকিতে পারে, তোমার রাজ্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি এই তত্ত্বটি হৃদয়ে রাখিয়া কাজ কর যে, জগৎ তোমার ভোগের জন্য নহে, আর উহা সাহায্যের জন্য তোমার কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না, তবে ওসকল থাকিলেও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। এই বৎসরেই হয়ত আমাদের কতকগুলি বন্ধু মরিয়া গিয়াছেন। জগৎ কি তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? ইহার স্রোত কি বন্ধ হইয়া আছে?—না, ইহা চলিয়া যাইতেছে। অতএব তোমার মন হইতে এই ভাব একেবারে তাড়াইয়া দাও যে, তুমি জগতের

কিছু উপকার করিতে পার। জগৎ তোমার নিকট হইতে কোন সাহায্য চাহে না। জগতের সাহায্যের জন্যই আমার জন্ম—এটি ভাবা খাঁটি অজ্ঞতা মাত্র। উহা অহঙ্কার বই আর কিছুই নহে। উহা স্বার্থপরতা বই আর কিছুই নহে—ধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়া মানবকে প্রতারণা করে মাত্র। যখন তুমি এই ভাবে তোমার স্নায়ু ও পেশীগুলিকে পর্য্যন্ত গঠন করিবে, তখন তোমার কষ্টরূপ কোন প্রতিক্রিয়া আসিবে না। যখন তুমি কোন লোককে কিছু দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আশা না কর, কৃতজ্ঞতার প্রতিদান পর্য্যন্ত যখন না চাও, তখন উহা তোমার উপর কোন কার্য্য করিবে না, কারণ তুমি কিছুই আশা কর নাই; তুমি কখনই চিন্তা কর নাই যে, তোমার প্রতিদান পাইবার কোন অধিকার আছে। তাহার যাহা প্রাপ্য ছিল, তাহাই তুমি দিয়াছিলে। তাহার নিজের কর্ম্মের ফলে সে ইহা পাইল, তোমার কর্ম্ম তোমাকে উহার বাহক করিয়াছিল মাত্র। কিছু দিয়া তুমি অহঙ্কৃত হইবে কেন—যখন তুমি ঐ অর্থের বাহক-স্বরূপ মাত্র? জগৎ নিজ কর্ম্মের দ্বারা উহা পাইবার উপযুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে অহঙ্কারের কারণ কি? জগৎকে তুমি যাহা দিতেছ, তাহা এমনই বা কি? অনাসক্তির ভাব লাভ করিলেই তোমার ভাল বা মন্দ কাজ কিছুই থাকিবে না। স্বার্থই কেবল ভালমন্দের প্রভেদ করিয়া থাকে। এইটি বুঝা বড় কঠিন জিনিস; কিন্তু তুমি সময়ে বুঝিবে, জগতে এমন কোন জিনিস নাই যাহা তোমার উপর তাহার শক্তি প্রকাশ

করিতে পারে—যতক্ষণ না তুমি তাহাকে তাহার শক্তি প্রকাশ করিতে দাও। মানুষের আত্মার উপর কোন শক্তিই কার্য্য করিতে পারে না, যতক্ষণ না আত্মা বোকা হইয়া ঐ শক্তির আজ্ঞা পালন করে। অতএব অনাসক্তির দ্বারা তোমার উপর সকল জিনিসের কার্য্য করিবার শক্তি তুমি অস্বীকার করিতেছ। ইহা বলা খুব সহজ যে, কোন জিনিসের তোমার উপর কার্য্য করিবার অধিকার নাই; কিন্তু যিনি বাস্তবিকই কোন শক্তিকে তাঁহার উপর কার্য্য করিতে দেন না, বহির্জ্জগৎ যাঁহার উপর কার্য্য করিলে যিনি সুখীও হন না, দুঃখিতও হন না—তাঁহার চিহ্ন কি? চিহ্ন এই যে, একটা পাহাড়ও যদি তাঁহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাঁহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, অথবা যদি তাঁহার সম্মুখে দিব্য দৃশ্যরাজি আবির্ভূত হয় অথবা দিব্য সুখসমুদয় উপস্থিত হয়, কিছুতেই তাঁহার মনে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না; শুভাশুভ উভয় অবস্থাতেই তিনি একরূপ থাকেন!

ব্যাসনামধেয় মহাপুরুষের নাম সকলেই অবগত আছে। তিনি বেদান্ত-দর্শনের লেখক—একজন ঋষি। ইঁহার পিতা সিদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; তাঁহার পিতামহও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিও অকৃতকার্য্য হন; এইরূপে তাঁহার প্রপিতামহও অকৃতকার্য্য হন। তিনিও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র শুকদেব সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ

করিলেন। ব্যাস সেই পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতে লাগিলেন। নিজে যতদূর শিক্ষা দিতে পারেন, দিবার পর তিনি শুকদেবকে জনক রাজার সভায় প্রেরণ করিলেন। বিদেহ জনক নামে এক মহারাজা ছিলেন; 'বিদেহ' অর্থে 'শরীর হইতে পৃথক্'। যদিও রাজা, তথাপি তিনি যে দেহ তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে কেবল আত্মা বলিয়াই জানিতেন। এই বালকটিকে তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য পাঠান হইল। রাজা জানিতেন যে, ব্যাসের ছেলে তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার জন্য আসিতেছেন, সুতরাং তিনি পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যখন এই বালক গিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরিগণ তাঁহার কোন খবরই লইল না। তাহারা কেবল তাঁহাকে বসিবার একটি আসন দিল। তিনি তথায় তিন দিন তিন রাত্রি বসিয়া রহিলেন, কেহ তাঁহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না, কেহই তাঁহাকে তিনি কে বা তাঁহার নিবাস কোথায় কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছে না। তিনি এত বড় একজন মহাপুরুষের পুত্র, তাঁহার পিতা সমুদয় দেশের একজন সম্মানাস্পদ ব্যক্তি, তিনি নিজেও একজন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য নীচ প্রহরিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার খোঁজখবরও লইতেছে না। তারপর হঠাৎ রাজার মন্ত্রিগণ এবং বড় বড় কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে মহাসম্মান-পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিতরে এক

সুশোভিত গৃহে লইয়া গেলেন, সুগন্ধি জলে স্নান করাইলেন, খুব ভাল ভাল পোষাক পরিতে দিলেন, আর আট দিন ধরিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বিলাসের ভিতর রাখিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের কোন বিকৃতি ঘটিল না। দ্বারে অপেক্ষার সময়ও তিনি যেরূপ ছিলেন, এই সকল বিলাসের মধ্যেও তিনি ঠিক সেইরূপই রহিলেন। তখন তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হইতেছিল। রাজা তাঁহাকে এক পেয়ালা দুগ্ধ দিলেন, পাত্রটি দুধে ধার পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বলিলেন, "এই দুগ্ধের পেয়ালাটি লইয়া সাতবার এই রাজসভা প্রদক্ষিণ করিয়া আস; সাবধান, যেন এক ফোঁটা দুগ্ধও না পড়ে।" বালক সেই পেয়ালা লইয়া এই সব গীত-বাদ্য ও সুন্দরী রমণীগণের মধ্য দিয়া সাতবার সভা প্রদক্ষিণ করিলেন। এক ফোঁটা দুগ্ধও পড়িল না! সেই বালকের মনের উপর এমন ক্ষমতা ছিল যে, যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছুরই দ্বারা আকৃষ্ট হইবে না। যখন তিনি সেই পাত্রটি রাজার নিকট আনয়ন করিলেন তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার পিতা তোমাকে যাহা শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহা শিখিয়াছ, আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি মাত্র— তুমি সত্য জানিয়াছ; যাও, এখন গৃহে গমন কর।"

অতএব দেখা গেল, যে ব্যক্তি আপনাকে বশ করিয়াছে

বাহিরের কোন বস্তু আর তাহার উপর কার্য্য করিতে পারে না, তাহাকে আর কাহারও দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার মন স্বাধীনতা-পদবী লাভ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত। আমরা সচরাচর দুই মতের লোক পাইয়া থাকি। কেহ কেহ দুঃখবাদী—তাঁহারা বলেন, এ পৃথিবী কি ভয়ানক, কি অসৎ! অপর কতকগুলি ব্যক্তি আবার সুখবাদী—তাঁহারা বলেন, এই জগৎ কি সুন্দর, কি অদ্ভুত! যাঁহারা নিজেদের মন জয় করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই জগৎ দুঃখে পূর্ণ, অথবা সুখদুঃখ-মিশ্রিত বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা যখন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিব, তখন ইহাই আবার সুখের সংসাররূপে পরিণত হইবে। তখন কোন কিছুই আমাদের উপর ভাল বা মন্দ ভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না। আমরা সবই বেশ সামঞ্জস্য-পূর্ণ দেখিতে পাইব। অনেক লোক আছে, যাহারা প্রথমে সংসারকে নরককুণ্ড বলিয়া পরিণামে আবার উহাকেই স্বর্গ বলিবে। আমরা যদি প্রকৃত কর্ম্ম-যোগী হই এবং নিজাদিগকে এই অবস্থায় লইয়া যাইবার জন্য শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা যেখানেই আরম্ভ করি না কেন, পরিশেষে পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থায় পৌঁছিবই। আর যখনই এই কল্পিত 'অহং' চলিয়া যায়, তখনই এই সমুদয় জগৎ, যাহা আপাততঃ অমঙ্গলপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা স্বর্গ এবং পরমানন্দে পূর্ণ বোধ হইবে। ইহার

হাওয়া পর্য্যন্ত বদলাইয়া ভাল হইয়া যাইবে, প্রত্যেক মানুষের মুখই ভাল বলিয়া বোধ হইবে। ইহাই কর্ম্ম-যোগের চরমগতি এবং ইহাই পূর্ণতা বা সিদ্ধি। অতএব দেখিতেছ, এই ভিন্ন ভিন্ন যোগগুলি পরস্পর-বিরোধী নহে। প্রত্যেকটিই আমাদিগকে চরমে একটি স্থানে লইয়া যায় এবং পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি করাইয়া দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটিরই দৃঢ় অভ্যাস আবশ্যক; অভ্যাসই ইহাদের সমুদয় রহস্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস—প্রত্যেক যোগ সম্বন্ধেই ইহা খাটে। প্রথমে ইহার বিষয় শুনিতে হইবে, তারপর বুঝিতে হইবে; অনেক বিষয় যাহা একেবারে বুঝিতে পার না, তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণে ও মননে অর্থাৎ চিন্তায় স্পষ্টীকৃত হইয়া যাইবে। সব বিষয় একেবারে বুঝা বড় কঠিন। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজেকে নিজে শিক্ষা দিতে হইবে—বাহিরের আচার্য্য কেবল উদ্দীপক কারণমাত্র। সেই উদ্দীপনা দ্বারা আমাদের অন্তরস্থ আচার্য্যই আমাদিগকে সমুদয় বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য উদ্বোধিত হন। তখন সমুদয় আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়, সুতরাং সমুদয়ই স্পষ্ট হইয়া আসে। তখন আমরা নিজেদের আত্মার ভিতরে ঐ তত্ত্বসকল অনুভব করিব এবং এই অনুভূতিই প্রবল ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হইবে। প্রথমে ভাব, তারপর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা হইতে এমন প্রবল কর্ম্মের শক্তি আসিবে

যে, তাহা প্রতি শিরায়, প্রতি স্নায়ুতে, প্রতি পেশীতে কার্য্য করিতে থাকিবে—যতক্ষণ না তোমার সমুদয় শরীরটি পর্য্যন্ত এই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের একটি যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। ইহার ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ—পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। ইহা কোন মতামত বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। কেহ খ্রীষ্টিয়ানই হউক, য়াহুদীই হউক, আর জেণ্টাইলই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই—তুমি কি স্বার্থশূন্য? তাহা যদি হও, তবে তুমি একখানি ধর্ম্মপুস্তকও না পড়িয়া এবং কোন গির্জ্জায় বা মন্দিরে না যাইয়াও সিদ্ধ হইবে। আমাদের বিভিন্ন যোগপ্রণালীর প্রত্যেকটিই অপর প্রণালীর কিছুমাত্র সহায়তা না লইয়া মানুষকে পূর্ণ করিতে সমর্থ, কারণ এই সকলগুলিরই একই লক্ষ্য। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—সকল যোগই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ ও অন্যনিরপেক্ষ উপায় হইতে পারে। "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ"—অজ্ঞেরাই কর্ম্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা নয়। জ্ঞানীরা জানেন, আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও চরমে তাহারা এক লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়—পূর্ণতাই এই চরমগতি।

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তি

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'কার্য্য' এই অর্থ ব্যতীত 'কর্ম্ম' শব্দদ্বারা কার্য্য-কারণ-ভাবও সূচিত হইয়া থাকে। যে কোন কার্য্য যে কোন চিন্তাতে কোন ফল উৎপাদন করে, তাহাকে 'কর্ম্ম' বলে। সুতরাং 'কর্ম্মবিধানের' অর্থ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের নিয়ম—কারণ থাকিলে তাহার ফল হইবেই হইবে, কোন-রূপেই উহার অন্যথা হইতে পারে না। আর ভারতীয় 'দর্শন'-মতে এই 'কর্ম্মবিধান' সমস্ত জগতেই রাজত্ব করিতেছে। আমরা যাহা কিছু দেখি, অনুভব করি অথবা যে কোন কার্য্য করি, একদিকে তাহারা পূর্ব্বকর্ম্মের ফলমাত্র, আবার অপর দিকে তাহারাই কারণ হইয়া অন্য ফল উৎপাদন করে। এই বিষয়ের আলোচনার সহিত 'বিধান' বা 'নিয়ম' শব্দের অর্থ কি তাহা বিচার করা আবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয়—ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্ত্তনের প্রবণতার নাম নিয়ম বা বিধি। যখন আমরা দেখি, একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনা হইতেছে অথবা কখন কখন যুগপৎ ঘটিতেছে, তখন আমরা আশা করি, এইরূপ সর্ব্বদাই ঘটিবে। আমাদের দেশের প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'ব্যাপ্তি' বলিতেন। তাঁহাদের মতে নিয়ম-সম্বন্ধে আমাদের সমুদয় ধারণা এই

ব্যাপ্তি হইতেই আসিয়া থাকে। কতকগুলি ঘটনাশ্রেণী আমাদের মনে অপরিবর্ত্তনীয়-ক্রমে জড়িত হইয়া থাকে। সেই জন্য কোন সময়ে কোন বিষয় অনুভব করিবামাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ মনের অন্তর্গত অন্যান্য কতকগুলি বিষয়কেও অমনি লক্ষ্য করিয়া থাকে। একটি ভাব—অথবা আমাদের মনোবিজ্ঞান অনুসারে চিত্তে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ—সর্ব্বদাই অনেক সদৃশ তরঙ্গপরম্পরা উৎপাদন করে। ইহাকেই ভাব-যোগ-বিধান বলে, আর 'কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ' এই 'ব্যাপ্তি'-নামধেয় যোগ-বিধানের একটি অংশমাত্র। অন্তর্জ্জগতে যেমন বহির্জ্জগতেও তেমন 'বিধানতত্ত্ব' (নিয়মতত্ত্ব) একই প্রকার। উহা এই—নিয়ম অর্থে মনের এই আকাঙ্ক্ষা যে, এক ঘটনার পর আর একটি ঘটনা ঘটিবে—আমাদের দৃষ্টি যতদূর চলে তাহাতে ঐ ক্রমপরম্পরা পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা হইলে, প্রকৃতিতে কোন নিয়ম নাই। কার্য্যতঃ ইহা বলা ভুল যে, পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ আছে অথবা প্রকৃতির কোন স্থলে কোন নিয়ম আছে। আমাদের মন যে প্রণালীতে কতকগুলি ঘটনাশ্রেণীকে ধারণ করে, সেই প্রণালীকেই নিয়ম বলে; উহা আমাদের মনে অবস্থিত। কতকগুলি ঘটনা একটির পর আর একটি অথবা একত্র সংঘটিত হইল; আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হইল, ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে পুনঃ পুনঃ ইহা ঘটিবে; এইরূপে মন, সমুদয় ঘটনাশ্রেণী যে ভাবে সংঘটিত হইতেছে তাহা ধরিতে পারে। ইহাকেই বলা যায়—নিয়ম।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—নিয়ম সর্ব্বব্যাপী বলিলে আমরা কি বুঝি? আমাদের জগৎ অনন্ত সত্তার সেই অংশটুকু যাহা—অস্মদ্দেশীয় মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাহাকে দেশ-কাল-নিমিত্ত বলেন—তাহা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই জগৎ সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র, এক নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা, অর্থাৎ দেশকাল-নিমিত্তে গঠিত। আর ঐরূপ ছাঁচে ঢালা অস্তিত্ব-সমষ্টির নামই আমাদের জগৎ। তাহা হইলেই ইহা নিশ্চিত যে, নিয়ম কেবল এই জগতের মধ্যেই সম্ভব, উহার বাহিরে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। যখন আমরা এই জগতের কথা বলি তখন আমরা বুঝি, অস্তিত্বের যে অংশটুকু আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ—ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ—যাহা আমরা অনুভব করি, স্পর্শ করি, দর্শন করি, চিন্তা করি, কল্পনা করি, জগতের ঐ অংশটিই কেবল নিয়মাধীন, কিন্তু উহার বাহিরে আর নিয়মের প্রসার নাই, যেহেতু কার্য্য-কারণ-ভাব উহার অধিক আর যাইতে পারে না। আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বস্তুই এই কার্য্য-কারণ-নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নহে। কারণ ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থে মানসিক সম্বন্ধ বা যোগ থাকিতে পারে না এবং ভাব-যোগ বা ভাব-সম্বন্ধ ব্যতীত কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যখন ইহা নাম-রূপের ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া যায়, তখন ইহা কার্য্য-কারণ-নিয়মে বাধ্য হইয়া থাকে এবং তখনই বলা হয় যে, উহা নিয়মের অধীন, যেহেতু কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধই নিয়মের মূল।

এক্ষণে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। ঐ বাক্যটিই স্ববিরুদ্ধ। কারণ ইচ্ছা কি তাহা আমরা জানি। আর যাহা কিছু আমরা জানি সমুদয়ই জগতের অন্তর্গত। আবার জগতের অন্তর্গত সমুদয়ই দেশ-কাল-নিমিত্তের ছাঁচে ঢালা। আর যে কোন জিনিস আমরা জানি অথবা যাহা কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব, সমুদয়ই কার্য্য-কারণ-বিধির অধীন। আর যাহা কিছু কার্য্য-কারণ-বিধির অধীন, তাহা কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। অপরাপর বস্তু ইহার উপর কার্য্য করিয়া থাকে। উহাও আবার এক সময়ে কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ চলিতেছে। কিন্তু যাহা ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, যাহা পূর্ব্বে ইচ্ছারূপী ছিল না, কিন্তু এই ছাঁচে পড়িয়া মনুষ্য-ইচ্ছা-রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বাধীন; আর যখন এই ইচ্ছা এই কার্য্য-কারণ-চক্রের ছাঁচ হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন ইহা পুনঃ স্বাধীন হইবে। স্বাধীনতা বা মুক্তি হইতেই উহা আসিতেছে—আসিয়া এই বন্ধনের ছাঁচে পড়িতেছে এবং ফিরিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতায় চলিয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন হইয়াছিল, জগৎ কোথা হইতে আসে, কাহাতে অবস্থিতি করে এবং কাহাতেই বা লীন হয়? ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল—মুক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি, বন্ধনে ইহার বিশ্রাম এবং অবশেষে মুক্তিতে ইহার পুনর্গতি। সুতরাং যখন আমরা বলি, মানুষ সেই অনন্ত সত্তার প্রকাশমাত্র, তখন

বুঝিতে হইবে উহা তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই দেহ ও এই মন—যাহা আমরা দেখিতেছি তাহারা—সমগ্র প্রকৃত মানবের এক অংশমাত্র, সেই অনন্ত পুরুষের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই সেই অনন্ত পুরুষের এক অংশমাত্র। আর আমাদের সমুদয় বিধি, আমাদের সমুদয় বন্ধন, আমাদের আনন্দ, আমাদের বিষাদ, আমাদের সুখ, আশা, ভরসা সবই কেবল এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। আমাদের উন্নতি অবনতি সবই এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরে। অতএব তোমরা দেখিতেছ, এই ক্ষুদ্র জগৎ চিরকাল থাকিবে ইহা আশা করা এবং স্বর্গে যাইবার আশা করা কি ছেলেমানুষী! স্বর্গের অর্থ—এই জগতের পুনরাবর্ত্তন। তোমরা স্পষ্টই দেখিতেছ, সমুদয় অনন্ত সত্তাকে আমাদের সীমাবদ্ধ জগতের মত করিতে চেষ্টা করা কি ছেলেমানুষী ও অসম্ভব ব্যাপার! অতএব যখন মানুষ বলে সে এইরূপ ভাবেই চিরদিন থাকিবে, এখন যাহা লইয়া আছে তাহা লইয়াই চিরদিন থাকিবে, অথবা আমি যেমন কখন কখন বলি, যখন মানুষ 'আরামের ধর্ম্ম' চায়, তোমরা নিশ্চয় করিয়া রাখিতে পার যে, সে এতদূর অবনত হইয়া পড়িয়াছে যে, সে এক্ষণে নিজে যাহা তাহার অতীত কিছু—সে বর্ত্তমানে যে সকল অবস্থার ভিতর রহিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু—ধারণা করিতে পারে না। সে নিজের অনন্ত স্বরূপ ভুলিয়াছে; তাহার সমুদয় ভাবই এই সব ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখে

এবং সাময়িক ঈর্ষাদিতে আবদ্ধ। সে এই সান্ত জগৎকেই অনন্ত বলিয়া মনে করে। শুদ্ধ তাহাই নহে, সে এই অজ্ঞান কোনমতে ছাড়িবে না। সে প্রাণপণে তৃষ্ণাকে অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের জ্ঞাত বস্তুর অতিরিক্ত অসংখ্য প্রকার সুখ-দুঃখ, অসংখ্য প্রকার প্রাণী, অসংখ্য প্রকার বিধি, অসংখ্য প্রকার উন্নতির নিয়ম এবং অসংখ্য প্রকার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু এই সমুদয়ই প্রকৃতির একদেশ মাত্র।

মুক্তিলাভ করিতে হইলে এই জগতের বাহিরে যাইতে হইবে; উহাত এখানে পাওয়া যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা লাভ বা খ্রীষ্টিয়ানেরা যাহাকে 'বুদ্ধির অতীত শান্তি' বলিয়া থাকেন, তাহা এই জগতে হইতে পারে না, স্বর্গেও নহে, অথবা এমন কোনও স্থানেও নহে যেখানে আমাদের চিন্তা-শক্তি অথবা মন যাইতে পারে, অথবা ইন্দ্রিয়গণ যেখানে কোনরূপ অনুভব করিতে পারে, অথবা কল্পনাশক্তি যথায় অগ্রসর হইতে পারে। ঐরূপ কোন স্থানেই উহা পাওয়া যাইতে পারে না, কারণ উহারা অবশ্যই আমাদের জগতের অন্তর্গত হইবে, আর সেই জগৎও অবশ্য দেশ-কাল-নিমিত্তে সীমাবদ্ধ। অবশ্য ঐ সকল স্থান এই পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে পারে—এমন অনেক স্থান আছে যাহা এই পৃথিবী অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, যেখানে ভোগ এখানকার অপেক্ষা তীব্রতর, কিন্তু উহারাও জগতের অন্তর্গত, সুতরাং নিয়মের

বন্ধনের ভিতর। অতএব আমাদিগকে উহাদের বাহিরে যাইতে হইবে। আর যেখানে এই ক্ষুদ্র জগতের শেষ, সেই-খানেই প্রকৃত ধর্ম্মের আরম্ভ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ, বিষাদ এবং জ্ঞান সবই সেখানে শেষ হইয়া যায় এবং প্রকৃত সত্য আরম্ভ হয়। যতদিন না আমরা জীবনের জন্য এই তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিতে পারি, যতদিন না এই ক্ষণস্থায়ী সত্তার প্রতি প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি, ততদিন সেই জগতের অতীত অনন্ত মুক্তির একবিন্দু আভাস পাইবারও আমাদের আশা নাই। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, মনুষ্যজাতির চরম গতি মুক্তিলাভ করিবার একমাত্র উপায় আছে—সেই উপায় এই যে, এই ক্ষুদ্র জীবনকে ত্যাগ করিতে হইবে, এই ক্ষুদ্র জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে, এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিতে হইবে, স্বর্গকে ত্যাগ করিতে হইবে, শরীরকে ত্যাগ করিতে হইবে, মনকে ত্যাগ করিতে হইবে—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে।

যদি আমরা ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জগৎকে ত্যাগ করিতে পারি, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইব। বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় নিয়মের বাহিরে যাওয়া, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলের বাহিরে যাওয়া; আর যেখানেই এই জগৎ আছে, সেখানেই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল বর্ত্তমান। কিন্তু এই জগৎকে ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প লোকই সংসার ত্যাগ করিতে পারে। আমাদের

শাস্ত্রে সংসারত্যাগের দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে। একটিকে নিবৃত্তিমার্গ বলে—উহাতে 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নহে, ইহা নহে) করিয়া সমুদয় ত্যাগ করিতে হয়; আর একটিকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে—উহাতে 'ইতি' 'ইতি' করিয়া সকল বস্তু ভোগ করিয়া তাহার পর ত্যাগ করা হয়। নিবৃত্তিমার্গ অতি কঠিন। উহা কেবল বিশেষ উন্নতমনা প্রবলইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষদের সাধ্য। তাঁহারা কেবল বলেন আমি ইহা চাহি না—বলিবামাত্র তাঁহাদের শরীর মন তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, আর তাঁহারা সংসারের বাহিরে চলিয়া যান। কিন্তু এরূপ লোক অতি দুর্লভ। অধিকাংশ লোক তাই প্রবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করে—তাহাতে এই জগতের ভিতর দিয়াই যাইতে হয়, এই বন্ধনগুলিকেই বন্ধন ভঙ্গ করিবার সহায়তারূপে গ্রহণ করা হয়। উহাও ত্যাগ, তবে ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ। উহাতে সমস্ত পদার্থকে জানিতে হয়, ভোগ করিতে হয়; এইরূপে উহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, উহাদের স্বরূপ বেশ করিয়া জানিতে পারিলে মন তবে উহাদিগকে ছাড়িতে পারিবে এবং অনাসক্ত হইয়া যাইবে। প্রথমোক্ত মার্গের সাধন—বিচার, আর শেষোক্তের—কার্য্য। প্রথমটি জ্ঞানীর জন্য, তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয়টি কর্ম্ম-যোগ—ইহাতে কর্ম্ম করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই জগতে কার্য্য করিতে হইবে। কেবল যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত, যাঁহারা আত্মা ব্যতীত আর কিছু কামনা করেন না, যাঁহাদের

মন আত্মা হইতে অন্যত্র কুত্রাপি গমন করে না, আত্মাই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কর্ম্ম না করিলে চলে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কর্ম্ম অবশ্য করিতে হইবে। একটি জলস্রোত স্বভাবতঃ কোন নদীর অভিমুখে স্বাধীনভাবে গমন করিতে করিতে একটি গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া ঘূর্ণিরূপে পরিণত হইল; সেই ঘূর্ণিরূপে কিছুকাল ঘুরিবার পর উহা আবার সেই উন্মুক্ত স্রোতের আকারে বহির্গত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যজীবন এই স্রোততুল্য। উহাও ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়াছে—নাম-রূপাত্মক জগতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, কিছুক্ষণ আমার বাপ, আমার মা, আমার নাম, আমার যশ প্রভৃতি বলিয়া চিৎকার করিতেছে, অবশেষে বাহির হইয়া উহা আপনার মুক্তভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছে। সমুদয় জগত জানুক বা নাই জানুক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা করিতেছে। প্রত্যেকেই এই সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং অবশেষে এই ঘূর্ণির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

তবে কর্ম্ম-যোগ কি?—কর্ম্মরহস্য অবগত হওয়া। আমরা দেখিতেছি, সমুদয় জগৎ কার্য্য করিতেছে। কিসের জন্য? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা লাভের জন্য; পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে—মনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা, সমুদয় বিষয়ে স্বাধীনতা মানুষ চাহিতেছে—সর্ব্বদাই মুক্তিলাভ করিতে এবং বন্ধন হইতে

পলাইতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র জগৎটাকে এই কেন্দ্রানুগা ও কেন্দ্রাতিগা শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি বলা যাইতে পারে। কর্ম্ম-যোগ আমাদিগকে কার্য্যের রহস্য—কর্ম্মের প্রণালী বলিয়া দেয়। এই জগতে চতুর্দ্দিকে কেবল ধাক্কা না খাইয়া, দীর্ঘ-কাল বিলম্বে অনেক টানা-পড়েনের পর প্রত্যেক জিনিসের স্বরূপ না দেখিয়া, যাহাতে লোকে শীঘ্র প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে এইজন্য কর্ম্ম-যোগ আমাদিগকে কর্ম্মের রহস্য, কর্ম্মের প্রণালী শিখায় অথবা পরিশ্রমে কিরূপে অধিক কার্য্য করা যায় তাহা শিখায়। ব্যবহার করিতে না জানিলে অনেকটা শক্তি বৃথা নষ্ট হইতে পারে। কর্ম্ম-যোগ কর্ম্মকে একটি রীতিমত বিদ্যা করিয়া তুলে। এই বিদ্যা দ্বারা তুমি জানিতে পারিবে, জগতের সমুদয় কার্য্যগুলির সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হইবে। কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী—করিতে হইবে, কিন্তু খুব উচ্চতর উদ্দেশ্য রাখিয়া কার্য্য কর। কর্ম্ম-যোগ আমাদিগকে স্বীকার করাইয়া লয় যে, এই জগৎ পাঁচ মিনিটের জন্য কিন্তু উহার মধ্য দিয়া চলা ব্যতীত কোন উপায় নাই। এখানে মুক্তি নাই, মুক্তি পাইতে হইলে আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে। জগতের বাহিরে যাইবার এই পথ পাইতে হইলে, আমাদিগকে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে যাইতে হইবে। এমন বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষ থাকিতে

পারেন, যাঁহাদের বিষয় আমি এইমাত্র বলিলাম, যাঁহারা একেবারে জগতের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে পারেন—যেমন সর্প উহার ত্বক পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে থাকিয়া উহা দেখিয়া থাকে। এরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কতকগুলি আছেন বটে, কন্তু অবশিষ্ট মানবগণকে ধীরে ধীরে উহারই ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, আর কর্ম্ম-যোগ এই কার্য্য হইতে খুব সুফল লাভ করিবার প্রণালী, রহস্য, উপায় জগৎকে দেখাইয়া দেয়।

কর্ম্ম-যোগ কি বলে? কর্ম্ম-যোগ বলে, তুমি নিরন্তর কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ কর। কোন বিষয়ের সহিত আপনাকে জড়াইও না। মনকে স্বাধীন করিয়া রাখ। যাহা কিছু দেখিতেছ, দুঃখ-কষ্ট সমস্তই জগতের অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার মাত্র; দারিদ্র্য, ধন ও সুখ সাময়িক মাত্র, উহারা আমাদের স্বভাবগত একেবারেই নহে। আমাদের স্বরূপ দুঃখের অথবা সুখের অথবা প্রত্যক্ষ বা কল্পনার একেবারে অতীত প্রদেশে; তথাপি আমাদিগকে সর্ব্বদাই কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। 'আসক্তি হইতে দুঃখ আসে, কর্ম্ম হইতে নয়।'

যখনই আমরা কার্য্যের সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলি, তখনই আমরা নিজেকে অতি দুঃখী বলিয়া মনে করি, কিন্তু উহার সহিত না মিশিলে আমরা আর কষ্ট অনুভব করি না। অপরের অধিকৃত একখানি সুন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে তোমার দুঃখ হয় না, কিন্তু তোমার নিজের খানি পুড়িয়া গেলে

তোমার কষ্টের সীমা থাকে না। কেন? উভয়খানিই সুন্দর ছবি, হয়ত দুইখানিই একই মূলছবির নকল, কিন্তু এক স্থলে কষ্ট অনুভব হয়, অপর স্থলে কিছুই হয় না; ইহার কারণ—একস্থলে তুমি ছবির সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিয়াছ, অপর স্থলে তাহা কর নাই। এই 'আমি' 'আমার' ভাবই সমুদয় দুঃখের জনক। অধিকারের ভাব হইতেই স্বার্থ আসিয়া থাকে এবং ঐ স্বার্থপরতা দুঃখ আনয়ন করে। প্রত্যেক স্বার্থপর কার্য্য বা চিন্তা আমাদিগকে কোন না কোন বিষয়ে আসক্ত করায়, আর আমরা অমনি সেই বস্তুর দাস হইয়া যাই। চিত্তের যে কোন তরঙ্গ হইতে 'আমি-আমার'-ভাব উত্থিত হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রীতদাস করিয়া তুলে। যতই আমরা 'আমি-আমার' বলি ততই দাসত্বের ভাব বর্দ্ধিত হয়, ততই দুঃখ বর্দ্ধিত হয়। এই হেতু কর্ম্মযোগ বলে—জগতে যত ছবি আছে সমুদয়ের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ কর, কিন্তু উহাদের সহিত আপনাকে মিশাইও না, 'আমার' কখনও বলিও না। যখনই আমরা বলি, 'ইহা আমার' তৎক্ষণাৎ দুঃখ আসিবে। মনে মনেও 'আমার ছেলে'—একথা বলিও না; ছেলেকে লইয়া আদর কর, তাহাকে লইয়া আনন্দ কর, কিন্তু 'আমার' বলিও না। 'আমার' বলিলেই দুঃখ আসিবে। 'আমার বাড়ী,' 'আমার শরীর' বলিও না। ঐ জায়গায়ই মুস্কিল। শরীর তোমারও নয়, আমারও নয়, কাহারও নয়। উহা প্রকৃতির নিয়মে

আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু আমরা মুক্ত—সাক্ষিস্বরূপ। এক খানি ছবি বা দেওয়াল যেরূপ স্বাধীন নহে, শরীরও তদ্রূপ স্বাধীন নহে। একটা দেহে আপনাকে আসক্ত করিবার কি আবশ্যক? কোন লোক একখানি ছবি আঁকিল। ছবি আঁকা শেষ হইবার পর সে দেহত্যাগ করিল। কেন উহাতে আসক্ত হও? উহাকে যাইতে দাও; 'আমি ঐ বস্তু অধিকার করিব' এই বলিয়া স্বার্থজাল বিস্তার করিও না। যখনই এই স্বার্থজাল বিস্তৃত হয়, তখনই দুঃখ আরম্ভ হয়।

অতএব কর্ম্মযোগী বলেন, প্রথমে এই স্বার্থপরতার জাল বিস্তার করিবার প্রবৃত্তিকে নাশ কর। আর যখন তুমি উহাকে দমন করিবার শক্তি লাভ করিবে, তখন মনকে থামাইয়া আর এরূপ তরঙ্গাকারে পরিণত হইতে দিও না। তারপর সংসারে গিয়া যতদূর পার কার্য্য কর। তখন সব স্থানে গিয়া মিশ, যেখানে ইচ্ছা যাও, তোমাকে কিছুতে স্পর্শ করিতে পারিবে না। পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তুমিও নির্লিপ্তভাবে থাকিবে; ইহাই বৈরাগ্য, ইহাই কর্ম্ম-যোগের মূল ভিত্তি— অনাসক্তি। আমি এইমাত্র তোমাকে বলিতেছি, অনাসক্তি ব্যতীত কোন যোগই হইতে পারে না। ইহাই সমুদয় যোগের ভিত্তি, আর পূর্ব্বে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইল তাহাই অনাসক্তি। যে ব্যক্তি গৃহবাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান এবং সুখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ করিয়া মরুপ্রদেশে গমন করে, সে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্ত হইতে পারে। তাহার একমাত্র সম্বল নিজের শরীর

তাহার সর্ব্বস্ব হইতে পারে, সে সেই দেহেরই সুখের জন্য হয়ত চেষ্টা করিতেছে। অনাসক্তি বাহিরের শরীরকে লইয়া নহে, অনাসক্তি মনে। 'আমি, আমার'—ইহাই শরীরের সহিত সংযোগের শৃঙ্খল-স্বরূপ। যদি শরীরের সহিত এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহের সহিত এই যোগ না থাকে, তবে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা অনাসক্ত। একজন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াও সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইতে পারে, আর একজন হয়ত চীরপহিত্, কিন্তু সে ভয়ানক আসক্ত। আমাদিগকে প্রথমে এই অনাসক্তি লাভ করিতে হইবে, তারপর নিরন্তর কার্য্য করিতে হইবে। কর্ম্ম-যোগী এই আসক্তি ত্যাগ করিবার প্রণালী আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। অবশ্য এই আসক্তি ত্যাগ করা অতি কঠিন।

সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপায় তাঁহাদের জন্য যাঁহারা ঈশ্বরের অথবা বাহিরের কোন সহায়তায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ কৌশল বা উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহাদিগকে নিজেদেরই ইচ্ছাশক্তি, মনঃশক্তি এবং বিচার অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে—তাঁহাদিগকে জোর করিয়া বলিতে হইবে, আমি অনাসক্ত হইব। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম-যোগসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। তাঁহারা কর্ম্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া কার্য্য করিয়া যান; সুতরাং কর্ম্মফলে আসক্ত হন না। তাঁহারা যাহা কিছু

দেখেন, অনুভব করেন, শুনেন বা করেন, সবই শ্রীভগবানের জন্য। আমরা যে কোন সৎকার্য্য করি না কেন, তাহার জন্য যেন আমরা মোটেই প্রশংসা না চাই। উহা প্রভুর প্রাপ্য, সুতরাং সমুদয় ফল তাঁহাকেই অর্পণ কর। আমরা আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যেরও কোন ফল কামনা যেন না করি, যেন মনে না করি যে, আমরা একটা খুব ভাল কাজ করিয়াছি। সকল কার্য্যই তাঁহার। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে যে, আমরা আমাদের প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, আর আমাদের প্রত্যেক কার্য্যপ্রবৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহা হইতে আসিতেছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

"যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সমদয়ই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান কর।" নিজে সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকিয়া যেন আমাদের সমুদয় শরীর, মন এবং সমুদয়ই ভগবানের নিকট অনন্ত বলিস্বরূপে প্রদত্ত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির পরিবর্ত্তে দিবারাত্র এই ক্ষুদ্র 'অহং'কে আহুতিদানরূপ মহাযজ্ঞ কর।

"জগতে ধন-অন্বেষণে গিয়া তোমাকেই একমাত্র ধন পাইয়াছি, আমি তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। জগতে একজন প্রেমাস্পদ খুঁজিতে গিয়া তোমাকেই একমাত্র

প্রেমাস্পদ পাইয়াছি, আমি তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলাম।” এইটি দিবারাত্র আবৃত্তি করিতে হইবে—“আমার জন্য কিছুই নহে; শুভ, অশুভ বা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে কোন বস্তুই হউক না কেন, কিছুই আমার জন্য নহে; আমি ও সকল চাহি না, আমি সমুদয়ই তোমাকে সমর্পণ করিলাম।”

দিবারাত্র এই আপাত-প্রতীয়মান ‘অহং’কে উড়াইয়া দিতে থাক, যতদিন পর্য্যন্ত না ঐ ত্যাগ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়, যতদিন পর্য্যন্ত না উহা শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করে এবং সমুদয় শরীরটি পর্যন্ত ঐ আত্মত্যাগরূপ ভাবের অধীন হইয়া যায়। তখন আমরা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি, কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। শব্দায়মান কামান ও ঘোর কোলাহলপূর্ণ রণক্ষেত্রে গমন করিলেও আমরা মুক্ত ও স্বাধীন থাকিব।

কর্ম্ম-যোগ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—কর্ত্তব্য কেবল নিম্নভূমিতেই করণীয়; তথাপি আমাদিগের প্রত্যেককেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই কর্ত্তব্য আমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ। উহা আমাদের পক্ষে রোগবিশেষ হইয়া পড়ে এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। উহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে এবং আমাদের সমুদয় জীবনটাই দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলে। ইহা মনুষ্য-জীবনের মহা বিভীষিকাস্বরূপ। “এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য; উহা মনুষ্যের

অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিয়া থাকে।” এই সব কর্ত্তব্যের ক্রীতদাসের দিকে চাহিয়া দেখ। কর্ত্তব্য—বেচারাদের কিছু ভাবিবার অবকাশ দেয় না, কর্ত্তব্য—তাহাদিগকে স্নানাহ্নিকের পর্য্যন্ত সময় দেয় না। কর্ত্তব্য সর্ব্বদাই যেন তাহাদের পিছনে লাগিয়া আছে। তাহারা বাটীর বাহিরে যায়, গিয়া কার্য্য করে, কর্ত্তব্য তাহাদের পিছনে লাগিয়াই আছে। তাহারা বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার তৎপর দিনের কর্ত্তব্য চিন্তা করে, সেখানেও কর্ত্তব্যের হাত হইতে ছাড়ান নাই। এ ত ক্রীতদাসের জীবন—অবশেষে অশ্বের ন্যায় লাগামে যোতা অবস্থায় মৃত্যু! লোকে কর্ত্তব্য এইরূপই বুঝিয়া থাকে। বাস্তবিক একমাত্র কর্ত্তব্য—অনাসক্ত হওয়া এবং স্বাধীন পুরুষের ন্যায় কার্য্য করা। সমুদয় কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ—আমাদের কর্ত্তব্য, বলিয়া যাহা মনে করিতেছি, এ সবই তাঁহার। আমরা যে জগতে প্রেরিত হইয়াছি ইহাতে আমরা ধন্য। আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইতেছি মাত্র। কে জানে আমরা ভাল করিতেছি কি মন্দ করিতেছি? উত্তমরূপে করিলেও আমরা ফলপ্রার্থনা করিব না, মন্দভাবে করিলেও তাহার জন্য চিন্তান্বিত হইব না। স্বাধীনভাবে শান্তিপূর্ণ হইয়া থাক ও খাটিয়া যাও। এই অবস্থা লাভ করা বড় কঠিন। দাসত্বকে কর্ত্তব্য বলিয়া, দেহের প্রতি দেহের ঘৃণিত আসক্তিকে কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা অতি সহজ। লোকে সংসারে যাইয়া টাকার

জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কেন উহা করিতেছ—তাহারা বলিবে উহা আমাদের কর্ত্তব্য। বাস্তবিক উহা কাঞ্চনের জন্য অস্বাভাবিক তৃষ্ণামাত্র। এই তৃষ্ণাকে তাহারা কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

যাহাকে সচরাচর কর্ত্তব্য বলা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে আর কি? উহা কেবল আসক্তি, চর্ম্মপরতন্ত্রতা মাত্র; কোন আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া গেলেই আমরা তাহাকে কর্ত্তব্য নাম দিয়া থাকি। যে সব দেশে বিবাহ নাই, সে সব দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন কর্ত্তব্যও নাই। ক্রমশঃ সমাজে যখন বিবাহ-প্রথা আসিয়া প্রবেশ করে এবং স্বামী-স্ত্রী একত্রে বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহারা দেহের টান বশতঃ একত্রে বাস করে, ক্রমশঃ বংশানুক্রমে উহা প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়া যায়, তখনই উহা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহা এক প্রকার চিরস্থায়ী ব্যাধিমাত্র। যখন উহা এক-আধ বার প্রবলাকারে দেখা দেয়, তখন আমরা উহাকে ব্যারাম বলি, আর যখন উহা সামান্যভাবে চিরস্থায়ী দাঁড়াইয়া যায়, আমরা উহাকে 'প্রকৃতি' আখ্যা দিয়া থাকি। যাহাই হউক, উহা রোগমাত্র। আসক্তিটা প্রকৃতিগত হইয়া গেলে আমরা উহাকে কর্ত্তব্যরূপ লম্বাচওড়া নামে অভিহিত করিয়া থাকি, আমরা উহার উপর ফুল ছড়াইয়া দিই, ঢেঁটরা পিটিতে থাকি, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া লই। তখন সমুদয় জগৎই ঐ কর্ত্তব্যের অনুরোধে পরস্পর

যুদ্ধ করিতে থাকে এবং একজন আর একজনের দ্রব্য অপহরণ করিয়া থাকে।

কর্ত্তব্য এই হিসাবে কতকটা ভাল যে, উহা পশুত্ব-ভাব কতক পরিমাণে নিবারণ করে। যাহারা অতিশয় নিম্নাধিকারী, যাহারা অন্য কোনরূপ আদর্শ ধারণা করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে উহা কতক পরিমাণে উপকারী বটে; কিন্তু যাঁহারা কর্ম্ম-যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যের ভাব একেবারে তাড়াইয়া দিতে হইবে। তোমার আমার পক্ষে কোন কর্ত্তব্যই নাই। যাহা তোমার জগৎকে দিবার থাকে দাও, কিন্তু কর্ত্তব্য বলিয়া নহে। উহার জন্য কিছু চিন্তা পর্য্যন্ত করিও না। বাধ্য হইয়া কিছু করিও না। কেন বাধ্য হইয়া করিবে? বাধ্য হইয়া যাহা কিছু কর, তাহাতেই আসক্তি আসিয়া থাকে। তোমার আমার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকিবার আবশ্যকতা কি?

"সমুদয়ই ঈশ্বরে সমর্পণ কর।" "এই সংসার-রূপ ভয়ানক অগ্নিময় কটাহে—যেখানে কর্ত্তব্যরূপ অনল সকলকে ঝলসাইয়া ফেলিতেছে, তথায় এই ঈশ্বরার্পণ-রূপ অমৃতপাত্র পান করিয়া সুখী হও।" আমরা কেবল তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেছি, পুরস্কার বা শাস্তির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি তুমি পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার সহিত তোমাকে শাস্তিও লইতে হইবে। শাস্তি এড়াইবার একমাত্র উপায়—পুরস্কার ত্যাগ করা। দুঃখ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সুখের

ভাবকে ছাড়িয়া দেওয়া, কারণ উভয়ই একসূত্রে গ্রথিত। একদিকে সুখ, আর একদিকে দুঃখ। একদিকে জীবন অপর দিকে মৃত্যু। মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়—জীবনের আশা পরিত্যাগ করা। জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, এক জিনিসেরই বিভিন্ন দিক্‌মাত্র। অতএব 'দুঃখশূন্য সুখ' এবং 'মৃত্যুশূন্য জীবন' কথাগুলি বিদ্যালয়ের ছেলেদের পক্ষে শুনিতে খুব ভাল বটে, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখেন, এগুলি কতকগুলি স্ববিরোধী বাক্যাংশমাত্র, সুতরাং তিনি উভয়ই পরিত্যাগ করেন; যাহা কিছু কর, তাহার জন্য কোনরূপ প্রশংসা বা পুরস্কারের আশা করিও না। ইহা অতি কঠিন কার্য্য। আমরা যদি কোন সৎকার্য্য করি, অমনি তাহার জন্য প্রশংসা চাহিতে আরম্ভ করিয়া থাকি। যাই আমরা কোন সৎকার্য্যে চাঁদা দিই, অমনি আমরা কাগজে আমাদের নাম দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি। এইরূপ বাসনার ফল অবশ্যই দুঃখ। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকেরা লোকের অজ্ঞাতভাবে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় তোমাদের পরিচিত বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিমাত্র। এইরূপ শত শত ব্যক্তি প্রতি দেশে আবির্ভূত হইয়া নীরবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। নীরবে তাঁহারা জীবনযাপন করেন ও নীরবে চলিয়া যান; সময়ে তাঁহাদের চিন্তারাশি বুদ্ধগণ ও খ্রীষ্টগণে ব্যক্তভাব ধারণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণই তখন আমাদের পরিচিত হন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ তাঁহাদের

জ্ঞান হইতে কোন নাম-যশের অন্বেষণ করেন নাই। তাঁহারা জগতে তাঁহাদের ভাব দিয়া যান, তাঁহারা নিজেদের জন্য কোনরূপ দাবী করেন না, অথবা নিজেদের নামে কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়া যান না। তাঁহাদের প্রকৃতিরই উহা বিরোধী। তাঁহারা শুদ্ধসাত্ত্বিক; তাঁহারা কোন চেষ্টা করিতে পারেন না, কেবল প্রেমে গলিয়া যান। আমি এইরূপ একজন যোগী * দেখিয়াছি, তিনি ভারতে এক গুহায় বাস করেন। আমি যত অদ্ভুত লোক দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ইনি একজন। তিনি তাঁহার আমিত্ব এতদূর হারাইয়াছেন যে, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, তাঁহার ভিতর যে মনুষ্যভাব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে কেবল ঈশ্বরীয় ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যদি কোন প্রাণী তাঁহার একটি হাত কামড়াইয়া দেয়, তিনি তাহাকে তাঁহার অপর হাতটিও দিতে প্রস্তুত হন এবং বলেন—ইহা প্রভুর ইচ্ছা। যাহা কিছু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সবই তিনি প্রভুর ইচ্ছা জ্ঞান করেন। তিনি লোকের সম্মুখে বাহির হন না, অথচ তিনি প্রেম, সত্য ও মধুর ভাবরাশির প্রস্রবণ-স্বরূপ।

তারপর অপেক্ষাকৃত অধিক রজঃশক্তিশালী পুরুষগণ আসেন। তাঁহারা সিদ্ধ পুরুষগণের ভাব গ্রহণ করিয়া জগতে উহা প্রচার করেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ভাবরাশি সংগ্রহ

* পওহারী বাবা।

করেন, আর বুদ্ধ খ্রীষ্টগণ আসিয়া সেই সব ভাব লইয়া স্থানে স্থানে প্রচার করিয়া বেড়ান। গৌতম-বুদ্ধের জীবন-চরিতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্বদাই আপনাকে পঞ্চবিংশ বুদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে চব্বিশ জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহারা অপরিচিত; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ঐতিহাসিক বুদ্ধ অবশ্য তাঁহাদের কৃত ভিত্তির উপরই নিজ ধর্ম্মপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁহারা চিন্তার শক্তি কতদূর তাহা জানেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানেন যে, যদি তাঁহারা কোন গুহায় গমন করিয়া গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটি বিষয় চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটি চিন্তাই অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সেই চিন্তাগুলি পর্ব্বত ভেদ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সমুদয় জগৎ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন এক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে এবং এমন লোক উৎপন্ন করিবে, যে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবে। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ভগবানের এত নিকটে অবস্থান করেন যে, তাঁহারা কর্ম্মশীল হইয়া জগতে পরোপকার, ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে অপারগ। কর্ম্মীরা যতই ভাল হন না কেন, তাঁহাদের কিছু না কিছু অজ্ঞান থাকিয়া যায়। যখন আমাদের স্বভাবে কিছু না কিছু অপবিত্রতা অবশিষ্ট থাকে, তখনই আমরা কার্য্য করিতে পারি—কর্ম্মের প্রকৃতিই এই। সাধারণতঃ উহাতে

অভিসন্ধি ও আসক্তি থাকে। কিন্তু সদাক্রিয়াশীল বিধাতা ও ঈশ্বরের সমক্ষে—যিনি ক্ষুদ্র চটকপক্ষীর পতন পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছেন—মানুষ তাহার নিজ কার্য্যের এতটা বড়াই কেন করে? যখন তিনি জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির পর্য্যন্ত খবর রাখিতেছেন, তখন ঐরূপ ভাবা কি একরূপ নাস্তিকতা নহে? আমাদের কেবল তাঁহার সমক্ষে ভয়-ভক্তি-সমাহিত চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলা উচিত—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষেরা কার্য্য করিতে পারেন না। "যিনি আত্মাতেই আনন্দ করেন, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, যিনি আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন কার্য্য নাই।" ইঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। ইঁহারা কার্য্য করিতে পারেন না, কিন্তু এতদ্ব্যতীত প্রত্যেককেই কার্য্য করিতে হইবে। তা বলিয়া ভাবিও না যে, তুমি জগতের অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও কিছু সাহায্য করিতে পার; তাহা তুমি পার না। এই জগৎরূপ শিক্ষালয়ে এই পরোপকার কার্য্যের দ্বারা তুমি নিজেই নিজের উপকার করিয়া থাক। কার্য্য করিবার সময় এইরূপ ভাব অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। যদি তুমি এই ভাবে কার্য্য কর, যদি তুমি সর্ব্বদাই মনে রাখ যে, কার্য্য করিতে পাওয়া তোমার পক্ষে মহা সৌভাগ্যের বিষয়, তবে তুমি কখন উহাতে আসক্ত হইবে না। জগৎ চলিয়াছেই—তোমার আমার মত লক্ষ লক্ষ লোকে মনে করে আমরা বড়লোক, কিন্তু আমরা যেই মরিয়া যাই, অমনি পাঁচ মিনিটের ভিতর জগৎ আমাদিগকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু

ঈশ্বরের জীবন অনন্ত "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" যদি সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু ইচ্ছা না করিতেন, তবে কে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিত, কে এক মুহূর্ত্তও শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিত? তিনিই নিয়ত-কর্ম্মশীল বিধাতা। সকল শক্তিই তাঁহার এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে, পৃথিবী বিধৃত রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতীতলে বিচরণ করিতেছে। তিনিই সব এবং তিনিই সকলে বিরাজিত। আমরা কেবল তাঁহার উপাসনা করিতে পারি মাত্র। কর্ম্মের সমুদয় ফল ত্যাগ কর, সৎকার্য্যের জন্যই সৎকার্য্য কর, তবেই কেবল সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসিবে। তখন হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে; আমরা পূর্ণ মুক্তি লাভ করিব। ইহাই কর্ম্মরহস্য।

অষ্টম অধ্যায়

কর্ম্ম-যোগের আদর্শ

কথা এই, আমরা বিভিন্ন উপায়ে সেই একই চরম অবস্থায় পৌঁছিতে পারি। এই উপায়গুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া থাকি: কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্তু ইহা যেন তোমাদের অবশ্য মনে থাকে যে, এই ভাগগুলি একেবারে অত্যন্ত-পৃথক বিভাগ নহে। প্রত্যেকটিই অপরটির অন্তর্গত। কিন্তু প্রাধান্য অনুসারে এই বিভাগ। ইহা সত্য নহে যে, তুমি এমন লোক বাহির করিতে পারিবে যাহার ভিতরে কর্ম্ম করা ব্যতীত অন্য কোনরূপ শক্তি নাই, অথবা যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই, অথবা যাহার শুধু ভক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল গুণপ্রাধান্যে। আমরা দেখিয়াছি, অবশেষে সমস্ত পথই এক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেয়। সকল ধর্ম্ম এবং সকল সাধন-প্রণালীই সেই এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইতেছে।

প্রথমে আমি সেই চরম লক্ষ্যটি কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সমুদয় জগতের চরম গতি কি?— মুক্তি। যাহা কিছু আমরা দেখি, অনুভব করি, অথবা শ্রবণ করি— পরমাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত, অচেতন প্রাণহীন জড়বস্তু হইতে সর্ব্বোচ্চ

মানবাত্মা পর্য্যন্ত, সকলেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই মুক্তির জন্য চেষ্টার ফল— এই জগৎ। সমুদয় যৌগিক পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুই অপর পরমাণুসমূহের নিকট হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে এবং অপরগুলি উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের নিকট হইতে এবং আমাদের চন্দ্র পৃথিবীর নিকট হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক জিনিসই অত্যন্ত বিস্তারোন্মুখী। আমরা জগতে সৎ, অসৎ বা উদাসীন যে কোন পদার্থ দেখিতেছি, এই জগতের ভিতর যত কার্য্য বা চিন্তা আছে সকলগুলিরই একমাত্র ভিত্তি—এই মুক্তির জন্য চেষ্টা। ইহারই প্রেরণায় সাধু উপাসনা করে এবং চোর চুরি করে। যখন কার্য্যপ্রণালী অযথা হয় তখন আমরা তাহাকে মন্দ বলি, আর যখন কার্য্যপ্রণালীর প্রকাশ যথাযথ ও উচ্চতর হয় তখন তাহাকে ভাল বলি। কিন্তু প্রেরণা উভয় স্থলেই সমান—সেই মুক্তির জন্য চেষ্টা। সাধু নিজের বন্ধন ভাবিয়া কাতর, তিনি উহা হইতে উদ্ধার পাইতে চাহেন, তজ্জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করেন। চোরও এই ভাবিয়া কাতর যে, তাহার কতকগুলি বস্তুর অভাব, সে ঐ অভাব হইতে মুক্ত হইতে চায়, এই হেতু সে চুরি করিয়া থাকে। চেতন অচেতন সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্যই এই মুক্তি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমস্ত জগৎই ঐ মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য সেই একই মুক্তির চেষ্টার প্রেরণায় সাধু ও চোর উভয়েই কার্য্য করিলেও উভয়ের ফল অত্যন্ত

ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। সাধু মুক্তির চেষ্টায় কার্য্য করিয়া অনন্ত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হন, কিন্তু চোরের কেবল বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতে থাকে।

প্রত্যেক ধর্ম্মেই আমরা মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টার বিকাশ দেখিতে পাই। ইহা সমুদয় নীতি, সমুদয় নিঃস্বার্থপরতার ভিত্তি। নিঃস্বার্থপরতা অর্থে 'আমি এই ক্ষুদ্র শরীর'—এই ভাবের অতীত অবস্থায় যাওয়া। যখন আমরা দেখিতে পাই, কোন লোক সৎকার্য্য করিতেছে, পরোপকার করিতেছে, তখন ইহার অর্থ এই বুঝায় যে, সেই ব্যক্তি 'আমি, আমার'-রূপ ক্ষুদ্র বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। এই স্বার্থপরতার গণ্ডীর বাহিরে 'এই পর্য্যন্ত' যাইতে পারা যায়, এইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। সকল বড় বড় নীতি-প্রণালীই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগকে চরমাদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। মনে কর, যেন লোকের এই সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগের অবস্থা লাভ করিবার শক্তি আছে; ইহা লাভ করিলে তাহার কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে? সে আর তখন ছোটখাট একটি রাম-শ্যাম থাকে না; সে তখন অনন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্ব্বে তাহার যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়। সে তখন অনন্ত-স্বরূপ হইয়া যায়। এই অনন্ত বিকাশপ্রাপ্তিই সমুদয় ধর্ম্মের এবং সমুদয় শিক্ষার লক্ষ্য; ব্যক্তিত্ববাদী যখন এই তত্ত্বটি দার্শনিকভাবে বিন্যস্ত দেখেন, তখন তিনি শিহরিয়া উঠেন।

কিন্তু নীতি প্রচার করিতে গিয়া তিনি নিজেই সেই একই তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। তিনিও মানুষের নিঃস্বার্থপরতার কোন সীমা নির্দ্দেশ করেন না। মনে কর, এই ব্যক্তিত্ববাদ-মতে কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইল। তাহাকে তখন অপরাপর সম্প্রদায়ের পূর্ণ-সিদ্ধ ব্যক্তি হইতে পৃথক রাখিবার উপায় কি? সে তখন জগতের সহিত এক হইয়া যায়; উহাই চরম লক্ষ্য। তবে ব্যক্তিত্ববাদী বেচারা তাঁহার নিজের যুক্তিগুলিকে তাহাদের যথার্থ সিদ্ধান্ত পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে সাহস করেন না। নিঃস্বার্থ কর্ম্ম দ্বারা মানব-জীবনের চরমাবস্থা এই মুক্তিলাভ করাই কর্ম্ম-যোগ। সুতরাং প্রত্যেক স্বার্থপূর্ণ কার্য্যই আমাদের সেই চরমাবস্থায় পোঁছিবার প্রতি-বন্ধক-স্বরূপ, আর প্রত্যেক নিঃস্বার্থ কর্ম্মই আমাদিগকে সেই চরম অবস্থার দিকে লইয়া যায়; এই হেতু 'নীতিসঙ্গত' ও 'নীতিবিরুদ্ধ' ইহাদের এই মাত্র সংজ্ঞা করা যায় যে, যাহা স্বার্থপর তাহা নীতিবিরুদ্ধ; যাহা নিঃস্বার্থপর, তাহাই নীতিসঙ্গত।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যের কথা বলিতে গেলে এত সোজাভাবে বলা চলে না। অবস্থাভেদে কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে। একই কার্য্য এক ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থপর এবং অপর ক্ষেত্রে স্বার্থপর হইতে পারে। সুতরাং আমরা কেবল কর্ত্তব্যের একটি সাধারণ সংজ্ঞা প্রদান করিতে পারি; বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য অবশ্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

এক দেশে এক প্রকার আচরণ নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে, অপর দেশে আবার তাহাই অতিশয় নীতিবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। আমরা দেখিতে পাই, সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্যই মুক্তি, আর এই মুক্তি কেবলমাত্র পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা হইতে লাভ হয়। আর প্রত্যেক স্বার্থশূন্য কার্য্য, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ বাক্য আমাদিগকে ঐ আদর্শের দিকে লইয়া যায়; এইজন্যই সেই কার্য্যকে নীতিসঙ্গত কার্য্য বলে। তুমি দেখিবে, এই সংজ্ঞাটি সকল ধর্ম্ম এবং সকল নৈতিক প্রণালী সম্বন্ধেই খাটিবে। নীতিতত্ত্বের মূল সম্বন্ধে অবশ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। কোন কোন প্রণালীতে উহা কোন মহান্ পুরুষ অর্থাৎ ভগবান হইতে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত। যদি তুমি সেই সকল সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা কর, মানুষ এ কাজ করিবে কেন, মানুষ ও-কাজ করিবে কেন, তাঁহারা উত্তর দিবেন—ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞা; কিন্তু যে মূল তত্ত্ব হইতে তাঁহারা ইহা পাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের নীতিতত্ত্বের মূল কথা—'নিজের' চিন্তা না করা, 'অহং'কে ত্যাগ করা। কিন্তু তথাপি নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা থাকিলেও অনেকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিতে ভীত। যে ব্যক্তি এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ধরিয়া থাকিতে চায়, তাহাকে আমি বলি, এমন এক ব্যক্তির চিন্তা কর, যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ—

যাহার নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই, যে নিজের জন্য কোন কার্য্য করে না, যে নিজের জন্য কোন কথা বলে না; এখন বল দেখি, তাহার 'নিজত্ব' কোথায়? যতক্ষণ সে নিজের জন্য চিন্তা করে, কার্য্য করে বা জ্ঞানোপার্জ্জন করে, ততক্ষণই তাহার 'নিজের' অস্তিত্ব। কিন্তু যদি কেবল তাহার অপর সম্বন্ধেই—জগতের সম্বন্ধেই জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সে 'নিজে' কোথায়? তাহার 'নিজত্ব' তখন একেবারে লোপ পাইয়াছে।

অতএব কর্ম্ম-যোগ নিঃস্বার্থপরতা বা সৎকর্ম্ম দ্বারা মুক্তি-লাভ করিবার এক প্রণালী-বিশেষ। কর্ম্ম-যোগীর কোন প্রকার ধর্ম্মমত অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন বা না করুন, কিংবা আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন বা না করুন, অথবা কোন প্রকার দার্শনিক বিচার করুন বা না করুন, কিছুতেই আসে যায় না। তাঁহার নিজের নিঃস্বার্থপরতা-লাভরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, আর তাঁহাকে নিজ চেষ্টায়ই উহা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত নিশ্চিতই অপরোক্ষা-নুভূতিস্বরূপ, কারণ জ্ঞানী বা ভক্ত মতামতের সহায়তা লইয়া বিচার বা ভক্তির দ্বারা যে সমস্যা-সমাধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তিনি কোন প্রকার মতামতের সহায়তা না লইয়া কেবল কর্ম্ম-দ্বারা সেই সমস্যারই পূরণে নিযুক্ত।

এক্ষণে প্রশ্ন আসিতেছে, এই কার্য্য কি? জগতের উপকার করা রূপ এই ব্যাপারটি কি? আমরা কি জগতের

কোন উপকার করিতে পারি? উপকার অর্থে পূর্ণ উপকার বুঝিলে বলিতে হইবে, না; কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে ধরিলে 'হাঁ' বলিতে হইবে। জগতের কোনরূপ চিরস্থায়ী উপকার করা যাইতে পারে না; তাহা যদি করা যাইত, তাহা হইলে ইহা আর এই জগৎ থাকিত না। আমরা পাঁচ মিনিটের জন্য কোন ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু সে আবার ক্ষুধার্ত্ত হইবে। আমরা মানুষকে যাহা কিছু সুখ দিতে পারি, তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কেহই এই নিত্য-আবর্ত্তনশীল সুখ-দুঃখরাশিকে একেবারে চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে না; জগৎকে কি কোন সুখরাশি নিত্যকালের জন্য দেওয়া যাইতে পারে? না, তাহা ত দেওয়া যাইতে পারে না। সমুদ্রের একস্থান নিম্নভাবাপন্ন না করিয়া তুমি একটি তরঙ্গও উত্থাপিত করিতে পারিবে না। জগতের অন্তর্গত শক্তিরাশির সমষ্টি বরাবর সমান—সর্ব্বদাই সমান। উহাকে বাড়ানও যায় না, কমানও যায় না। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জ্ঞাত মনুষ্যজাতির ইতিবৃত্ত দেখ। সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই সুখ-দুঃখ, সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই পদের তারতম্য—কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, কেহ উচ্চপদস্থ কেহ নিম্নপদস্থ, কেহ সুস্থ কেহ বা অসুস্থ। প্রাচীন মিশরবাসী অথবা গ্রীক বা রোমানদের যে অবস্থা ছিল, আধুনিক আমেরিকানদের সেই অবস্থা। জগতের ইতিহাস আমাদের যতটা জানা আছে তাহাতে দেখিতে পাই, মনুষ্যের অবস্থা বরাবর একই প্রকার। কিন্তু আবার ইহাও

দেখিতে পাইতেছি যে, সুখ-দুঃখের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে উহা কমাইবার চেষ্টাও বরাবর রহিয়াছে। ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই সহস্র সহস্র নরনারীর কথা পাওয়া যায়, যাঁহারা অপরের জীবনের পথ মসৃণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কিন্তু কখনই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা একটি বল্‌কে (ball) একস্থান হইতে আর একস্থানে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়ারূপ খেলাই করিতে পারি। আমরা শরীর হইতে কষ্ট তাড়াইলাম, উহা মনে গিয়া আশ্রয় লইল। ইহা ঠিক দান্তের (Dante) সেই নরক-চিত্রের ন্যায়— কৃপণদিগকে রাশীকৃত সুবর্ণ দেওয়া হইয়াছে; তাহারা পাহাড়ের উপর উহা ঠেলিয়া তুলিতেছে, আবার উহা গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে। এইরূপে এই চক্র ঘুরিতেছে। সত্যযুগ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হয়, সে সমস্তই স্কুলের ছেলেদের জন্য সুন্দর গল্প হইতে পারে, কিন্তু উহারা তাহা হইতে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। যে সকল জাতি এই সত্যযুগের স্বপ্ন দেখে, তাহারা আবার ইহাও ভাবিয়া থাকে যে, ঐ সময়ে তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবে। এই সত্যযুগ সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত নিঃস্বার্থ ভাব।

তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, আমরা এই জগতের সুখবৃদ্ধি করিতে পারি না। এইরূপ আমরা ইহার দুঃখও বাড়াইতে পারি না। জগতের ব্যক্ত শক্তিসমষ্টি সর্ব্বদাই সমান। আমরা কেবল উহাকে এদিক হইতে ওদিকে এবং

ওদিক হইতে এদিকে ঠেলিয়া দিতেছি মাত্র, কিন্তু উহা চিরকালই একরূপ থাকিবে, কারণ এইরূপ থাকাই উহার স্বভাব। এই জোয়ার-ভাঁটা, এই উঠা-নামা উহার স্বভাব। মৃত্যুশূন্য জীবন বলা যদি সঙ্গত হয়, তবে আমরা উত্থানকে পতন হইতে পৃথক করিতে পারি। মৃত্যুশূন্য জীবন বৃথা বাক্যমাত্র। কারণ জীবন অর্থে নিয়ত মৃত্যু। এই আলোটি ক্রমাগত পুড়িতেছে; ইহাই উহার জীবন। যদি তুমি জীবন প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তোমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতে হইবে। উহা কেবল একই জিনিসের দুইটি বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্ট মাত্র; উহারা একই তরঙ্গের উত্থান ও পতনস্বরূপ এবং উহাদের দুইটিকে একত্র করিলেই তবে একটি অখণ্ড বস্তু হয়। একজন পতনের দিকটা দেখেন, দেখিয়া দুঃখবাদী হন। অপরে উত্থানের দিকটা দেখেন, দেখিয়া সুখবাদী হন। বালক বিদ্যালয়ে যাইতেছে, বাপ মা তাহার সমুদয় ভার লইয়া আছেন; তখন সকলেই তাহার পক্ষে সুখকর প্রতীয়মান হয়। তাহার অভাব খুব সামান্য, সুতরাং সে একজন খুব সুখবাদী হয়। কিন্তু বৃদ্ধ—যিনি অনেক ঠেকিয়াছেন, তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছেন। এইরূপে প্রাচীন জাতিরা—যাহারা চতুর্দ্দিকে কেবল পূর্ব্ব গৌরবের ধ্বংসাবশেষ দেখিতেছে—নূতন জাতি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম আশাসম্পন্ন। ভারতবর্ষে একটি চলিত কথা আছে—'যাহা হাজার বছর শহর, তাহাই

আবার হাজার বছর বন।' এই পরিবর্ত্তন চলিয়াছেই। লোকে এই চিত্রের যখন যে দিক দেখে, তখন সে সেইরূপ—হয় সুখবাদী, নয় দুঃখবাদী হয়।

এক্ষণে আমরা সাম্যভাব সম্বন্ধে বিচার করিব। এই সত্যযুগের ধারণা অনেকের পক্ষে কার্য্য করিবার মহা প্ররোচকস্বরূপ হইয়াছে। অনেক ধর্ম্মই ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মের এক অঙ্গস্বরূপে প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা, ঈশ্বর জগতের শাসন করিতে আসিতেছেন। তিনি আসিলে তখন আর লোকের ভিতর কোন অবস্থার প্রভেদ থাকিবে না। যাহারা ইহা প্রচার করে, তাহারা অবশ্য গোঁড়া মাত্র; কিন্তু তাহারা যে খুব অকপট, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মও এই গোঁড়ামি দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছিল—তাহাতেই গ্রীক এবং রোমক দাসগণ উহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে আর দাসত্ব করিতে হইবে না, তাহারা যথেষ্ট পরিমাণ খাইতে-পরিতে পাইবে—তাহাতেই তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের ধ্বজার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছিল। যাহারা প্রথমে উহা প্রচার করিয়াছিল, তাহারা অবশ্য গোঁড়া অজ্ঞ ছিল, কিন্তু তাহারা প্রাণের সহিত উহা বিশ্বাস করিত। বর্ত্তমান কালে উহাই সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃ-ভাবের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাও গোঁড়ামি। এই সাম্যভাব জগতে কখনও হয় নাই এবং কখন হইতেও

পারে না। কি করিয়া জগতে এই সাম্যভাব হইবে? তাহা হইলে যে জগতে মৃত্যু উপস্থিত হইবে। জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ কি?—বৈষম্যভাব। জগতের আদিম অবস্থায়—প্রলয়াবস্থায়ই সম্পূর্ণ সাম্যভাব থাকে। এই সকল বিভিন্ন শক্তির তবে কিরূপে উদ্ভব হয়? বিরোধ, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারাই এই সকল শক্তির উদ্ভব। মনে কর, যদি এই ভৌতিক পরমাণুগুলি সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কি সৃষ্টি থাকিবে? আমরা বিজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি, তাহা হইতে পারে না। জল নাড়িয়া দাও, তুমি দেখিবে প্রত্যেক জলবিন্দু আবার স্থির হইবার চেষ্টা করিবে, একটি আর একটির দিকে দৌড়াইয়া যাইবে। এইরূপেই এই জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। আর এতদন্তর্গত সকল পদার্থই তাহাদের নষ্ট সাম্যভাব পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছে। আবার বৈষম্যাবস্থা আসিবে—তাহা হইতেই আবার এই সৃষ্টিরূপ যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইবে। বৈষম্যই জগতের ভিত্তি। আবার সৃষ্টির পক্ষে যেমন সাম্যভাব-বিনাশকারী শক্তির প্রয়োজন, তদ্রূপ সাম্যভাব-স্থাপনকারী শক্তিরও প্রয়োজন।

সম্পূর্ণ সাম্যভাব—যাহার অর্থ সমুদয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য, তাহা জগতে কখনই হইতে পারে না। এই অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই জগৎ শীতল হইয়া গিয়া বিশাল হিমরাশিতে পরিণত হইবে, আর

এখানে কেহই থাকিবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি, এই সত্যযুগ অথবা সম্পূর্ণ সাম্যভাব সম্বন্ধে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু যদি আমরা ঐ ধারণাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতাম, তবে তাহা সেই প্রলয়ের দিন সন্নিহিত করিয়া দিত। তারপর আবার মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে পরস্পর ভিন্নতা রহিয়াছে। মানুষে মানুষে প্রভেদ করে কিসে? মস্তিষ্কের ভিন্নতা। আজকালকার দিনে পাগল ছাড়া আর কেহই একথা বলিবে না যে, আমরা সকলে একরূপ মস্তিষ্কের শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা সকলেই জগতে বিভিন্ন শক্তি লইয়া আসিয়াছি। কেহ বড়, কেহ বা সামান্য লোক হইয়া আসিয়াছি, ইহা অতিক্রম করিবার জো নাই। আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই দেশে বাস করিতেছিল, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক ছিলেন। যদি আমরা সকলেই সমান হই, তবে এ প্রভেদ আসিল কোথা হইতে? যদি আমরা সকলে সমান হই, তবে ইণ্ডিয়ানরা কেন নানাপ্রকার উন্নতি করিল না? কেনই বা নগরাদি নির্ম্মাণ করিল না? কেনই বা তাহারা চিরকাল বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইল? বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন প্রকারের পূর্ব্ব-সংস্কারসমষ্টি আসিয়া এবং কার্য্য করিয়াই এই ব্যাপার সাধন করিয়াছে। সম্পূর্ণ সাম্যভাব অর্থে মৃত্যু। যতদিন এই জগৎ থাকিবে, ততদিন বৈষম্যভাব

থাকিবে; যুগচক্র যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখনই সত্যযুগ আসিবে। তাহার পূর্ব্বে সাম্যভাব আসিতে পারে না। তাহা হইলেও এই সাম্যভাবের ধারণা আমাদের পক্ষে এক প্রবল কার্য্যপ্রবৃত্তিদায়িনী শক্তি। যেমন সৃষ্টির পক্ষে এই বৈষম্যের উপযোগিতা আছে, সেইরূপ উহাকেই কমাইবার চেষ্টারও উপযোগিতা আছে। বৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টি থাকিত না, আবার মুক্তিলাভের ও ঈশ্বরসন্নিধানে যাইবার চেষ্টা না থাকিলেও সৃষ্টি থাকিত না। এই দুই শক্তির তারতম্যেই মানবের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অভিসন্ধি আসিয়া থাকে, আর ইহারা চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে।

এই 'চক্রের ভিতরে চক্র'—এ বড় ভয়ানক যন্ত্র। ইহার ভিতরে হাত দিলেই আমরা গেলাম। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভাবি যে, কোন বিশেষ কর্ত্তব্য সমাধা হইয়া গেলেই আমরা বিশ্রামলাভ করিব, কিন্তু তাহার খানিকটা করিবার পূর্ব্বেই আর একটা যেন উন্মুখ হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্র আমাদের সকলকেই টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা হইতে বাঁচিবার দুইটিমাত্র উপায় আছে: একটি হইতেছে এই যন্ত্রের সহিত সংশ্রব একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া—উহাকে চলিতে দাও, তুমি একধারে সরিয়া দাঁড়াও। বাসনা সব ত্যাগ কর। ইহা বলা খুব সহজ, কিন্তু করা একরূপ অসম্ভব। দুই কোটি লোকের ভিতরে একজন পারে কি না বলিতে পারি না। অপর উপায়—এই জগতে ঝাঁপ দিয়া

কর্ম্মের রহস্য অবগত হওয়া—উহাকেই কর্ম্ম-যোগ বলে। পলাইও না; উহার ভিতরে দাঁড়াইয়া কর্ম্মের রহস্য শিখ। কর্ম্মের দ্বারাই আমরা কর্ম্মের বাহিরে যাইব। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়াই বাহির হইবার পথ।

আমরা এক্ষণে দেখিলাম, এই কর্ম্ম কি। সংক্ষেপে সমুদয় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, এই কর্ম্ম সর্ব্বদাই চলিবে, আর যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর এমন একজন অসমর্থ পুরুষ নন যে তিনি আমাদের নিকট হইতে সাহায্যের প্রার্থী। দ্বিতীয়তঃ, এই জগৎও চিরকাল চলিবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের গন্তব্যস্থান মুক্তি, আমাদের লক্ষ্য নিঃস্বার্থপরতা। কর্ম্ম-যোগ-মতে কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে ঐ চরম স্থান লাভ করিতে হইবে, এই জন্যই আমাদের কর্ম্মরহস্য-জ্ঞানের প্রয়োজন। সমুদয় জগৎকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিবার ইচ্ছারূপ মনোভাব গোঁড়াদের পক্ষে কার্য্যপ্রবৃত্তির উত্তেজক বলিয়া ভাল হইতে পারে, এই মূর্খোপযোগী ধারণাসকল প্রাচীন কালে হয়ত খুব উপকার করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের এটি জানা উচিত যে উহাতে ভাল যেমন, তেমনই মন্দও হইয়াছে। কর্ম্ম-যোগী জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম্ম করিবার জন্য তোমার কোন অভিসন্ধির প্রয়োজন কি? অভিসন্ধি তোমাকে যেন স্পর্শ না করে। তোমার কর্ম্মেই অধিকার, ফলে অধিকার নাই—'কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' কর্ম্ম-যোগী বলেন, মনুষ্য

এ বিষয়ে আপনাকে শিক্ষিত করিতে পারে। যখন লোকের উপকার করিবার ইচ্ছা তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইবে, তখন তাহার বাহিরের অভিসন্ধির আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না। লোকের উপকার আমরা কেন করিব? উহা আমার ভাল লাগে বলিয়া; তারপর আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না। ভাল কাজ কর, কারণ ভাল কাজ করা ভাল। কর্ম্ম-যোগী বলেন, যে স্বর্গে যাইবে বলিয়া সৎকর্ম্ম করে, সে আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। অভিসন্ধিযুক্ত হইয়া যে কাজ করা যায়, তাহা আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তির দিকে না লইয়া গিয়া আমাদের চরণে আর একটি শৃঙ্খল পরাইয়া দেয়। যদি আমরা মনে করি, এই কর্ম্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে আমরা স্বর্গ নামক একস্থলে আসক্ত হইব। আমাদিগকে স্বর্গে গিয়া স্বর্গসুখসমুদয় ভোগ করিতে হইবে; উহা আমাদের পক্ষে আর একটি বন্ধনস্বরূপ হইবে।

অতএব, একমাত্র উপায়—সমুদয় কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর, অনাসক্ত হও। এইটি জানিয়া রাখ যে, জগৎ আমরা নহি; আমরা বাস্তবিক শরীর নহি, আমরা বাস্তবিক কার্য্য করি না। আমরা আত্মা, আমরা অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্রাম ও শান্তিসুখ সম্ভোগ করিতেছি। আমরা কেন কিছুর দ্বারা বদ্ধ হইব? আমাদের রোদনের কোন কারণ নাই, আত্মার পক্ষে কাঁদিবার কিছুই নাই। এমন কি, অপরের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও আমাদের কাঁদিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা

এইরূপ কান্নাকাটি ভালবাসি বলিয়াই আমরা কল্পনা করি যে, ঈশ্বর তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া এইরূপে কাঁদিতেছেন। এইরূপ ঈশ্বর আমাদের লাভ করিবার উপযুক্ত নহেন। ঈশ্বর কাঁদিবেনই বা কেন? ক্রন্দন ত বন্ধনের চিহ্ন—দুর্ব্বলতার চিহ্ন। একবিন্দুও চক্ষের জল যেন না পড়ে। এইরূপ হইবার উপায় কি? 'সম্পূর্ণ অনাসক্ত হও' বলা খুব ভাল বটে, কিন্তু হইবার উপায় কি? আমরা অন্য-অভিসন্ধি-শূন্য হইয়া যে কোন সৎকার্য্য করি, তাহা আমাদের পদে একটি নূতন শৃঙ্খলস্বরূপ না হইয়া বরং যে শৃঙ্খলে আমরা বদ্ধ রহিয়াছি, তাহারই একটি গাঁট ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। আমরা প্রতিদান-চিন্তাশূন্য হইয়া জগতে যে কোন সৎচিন্তা প্রেরণ করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে—আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের একটি গাঁট ভাঙ্গিয়া দিবে এবং আমাদিগকে ক্রমশঃই পবিত্রতর করিতে থাকিবে—যতদিন না আমরা পবিত্রতম মনুষ্যরূপে পরিণত হই। কিন্তু ইহা লোকের নিকট যেন কেমন অস্বাভাবিক ও দার্শনিক রকমের বোধ হয়, যেন উহা তেমন কার্য্যকর নহে। আমি গীতার বিরুদ্ধে অনেক তর্ক পড়িয়াছি, অনেকেই তর্ক তুলিয়াছেন—অভিসন্ধি ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। ইঁহারা গোঁড়ামি দ্বারা প্রবর্ত্তিত কার্য্য ব্যতীত কোনরূপ নিঃস্বার্থ কার্য্য জানেন না এবং কখন দেখেন নাই; এইজন্যই তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

আমি অল্প কথায় তোমাদের নিকট এমন এক লোকের কথা বলিব, যিনি এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবই এই কর্ম্ম-যোগী—একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেরই কর্ম্মপ্রয়োজক প্রবৃত্তির কারণ ছিল—বাহিরের অভিসন্ধি। কারণ তিনি ব্যতীত জগতের সমুদয় মহাপুরুষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—একদল বলেন—আমরা ঈশ্বর, জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি; অপর দল বলেন—আমরা ঈশ্বর-প্রেরিত; উভয়েরই কার্য্যের প্রেরণা-শক্তি বাহির হইতে আসে। আর তাঁহারা যতদূর আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বহির্জ্জগৎ হইতেই তাঁহাদের পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষ-গণের মধ্যে বুদ্ধই একমাত্র বলিয়াছিলেন, "আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতামত বিচার করিবার আবশ্যক কি? সৎ হও এবং সৎকার্য্য কর। ইহাই তোমাকে, সত্য যাহাই হউক না, তাহাতে লইয়া হইবে।"

তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রকার অভিসন্ধিবর্জ্জিত ছিলেন; আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এতদূর গিয়াছেন। সমুদয় মনুষ্যজাতি কেবল এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে—এতদূর উন্নত দর্শন! এমন

অদ্ভুত সহানুভূতি! এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্য্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ লোকের নিকট কোন দাবী-দাওয়া নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্ম্ম-যোগী—তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; আর মনুষ্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে—যত লোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত আর সকলের তুলনা হয় না, তিনিই হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যভাবের উদাহরণ—আত্মশক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ। জগতে যত সংস্কারক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথম সাহসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "কোন প্রাচীন হস্তলিপি-পুঁথিতে কোন বিষয় লেখা আছে বলিয়া বা তোমার জাতীয় বিশ্বাস বলিয়া অথবা বাল্যাবস্থা হইতেই তুমি কোন বিশেষ বিশ্বাসে গঠিত হইয়াছ বলিয়াই কোন বিষয় বিশ্বাস করিও না; কিন্তু বিচার করিয়া, তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখ—সকলের পক্ষে উহা উপকারী, তবেই উহাতে বিশ্বাস কর, ঐ উপদেশমত জীবন যাপন কর এবং অপরকে ঐ উপদেশানুসারে জীবনযাপন করিতে সাহায্য কর।"

যিনি অর্থ বা অন্য কোনরূপ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য্য করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে কার্য্য করেন; আর মানুষ যখন ইহা করিতে সমর্থ হইবে, তখন সেও একজন

বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কার্য্যশক্তির প্রকাশ হইবে, যাহাতে জগতের অবস্থা সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতে পারে। বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তির নিজ জীবনই তখন কর্ম্ম-যোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে।